হলুদ পোড়া

হলুদ পোড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয়
১৬সি, নিমতলা লেন
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন—১৩৩৬

জ্ঞানোদয়ের পক্ষে রমা রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও স্টার প্রিন্টিং
প্রেস, ২১/এ রাধানাথ বোস লেন, কলিকাতা-৬
হইতে গোপাল পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র :

প্রকাশকের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশিতম জন্মদিনে প্রকাশিত হলো তাঁর বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থ হলুদ পোড়া'র নতুন একটি সংস্করণ। আজ থেকে চার দশকেরও বেশি সময় আগে প্রথম প্রকাশিত ও এতকাল অমুদ্রিত এই গ্রন্থটি আজকের পাঠকের হাতে আজ তুলে দিতে পেরে প্রকাশক হিসাবে আমরা গর্বিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় রচনার স্বত্বাধিকারীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রেস-কপি তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করেছেন শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী। এঁদের ধন্যবাদ জানানো বাহুল্য মাত্র।

হলুদ পোড়া

সে-বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে-পরে গাঁয়ে দু'দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল-সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বন-জঙ্গলের আবরণ নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হলো না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্য পক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হৈচৈ হলো কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের

আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হলো পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানাজনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, ‘পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি—’

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পূব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

২

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে। গাঁয়ে সে-ই একমাত্র ডাক্তার পাশ-না করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাস করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাই-ব্রেরি, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু-বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার-আনা আট-আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হলো, কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসচে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে! তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয় ?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তুমিও কি ব'লে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে ?'

নবীন আমতা-আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু-জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধহয় সেই খাতিরেই কৈলাশ ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু-জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর সাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই ব'লে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ তক্। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হলো। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন রও। এখনি হয়েছে কি ! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়।'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ করো, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ—পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়েপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল-ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি-দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, একসময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই ? বল, তুই কে ?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।'

'চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা ? যে খুন হয়েছে ?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা ?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো ? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট্ করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হলো কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হলো না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচা-পাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুদ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে-মশানে দিন-ক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর ক'রে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্তিক

মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাতমাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে-নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোনদিক থেকে কিভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরানো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোনো বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ্। যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপর্দার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হলো, মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল ঃ কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি ? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষ মোচনের জন্য দরকারি ক্রিয়াকর্মের বিষয় আঁলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত, স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি ?

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। একমাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে-পায়ে না ধরাই ভালো। মাথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তাহলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার

নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীর বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষ-বেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ-ঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মতো কি যেন একটা নড়াচড়া করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উর্টিপড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশ-ঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি, মাস্টার-বাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তি পিসি বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়া-আড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধ্যের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশপাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পূব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু-ধারের বাঁশ-ঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি—ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে ?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু-প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোনোকিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হলো। সন্ধ্যাদীপ না জেবলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জেবলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না

করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না ?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু-তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো! বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো! কি হয়েছে ? পড়ে গেছ নাকি ?'

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ন গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হলো। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

বোমা

পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়,...অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনকার মতো অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশি কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজি অতি বেঠিক হিসাবও হয়তো অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন ঃ এত বোমা ফাটে কেন?

জীবন্ত প্রশ্ন জবাব আবিষ্কার করবেই। তার ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়তো বোমা ফাটাফাটি সম্বন্ধে এমন কড়া ব্যবস্থাই হবে যে বোমা আর একরকম ফাটবেই না।

আর তার ফলে হয়তো পৃথিবী জুড়ে এমন ভীষণ নিঃশব্দ শান্তি বিরাজ করবে যে গোপালের পর্যন্ত মনে হবে আর একবার পৃথিবীটা পাক দিয়ে আসা যাক। ঘরের চেয়ে বাইরের শান্তি বেশি হলে অশান্ত মানুষের কি ঘরের টান থাকে?

আহা, এত ভালো মানুষ হয়েছে গোপাল, দোতলা একটা বাড়িতে এত যত্নে সে এমন নিবিড় শান্তিপূর্ণ সংসার পেতেছে, রোজ রাত্রে নীল আলো জ্বালা ঘরে তাকেই বিবসনা করার অধিকার পেয়েছে, যার জন্য একবার পৃথিবীটাই সে পাক দিয়ে এসেছিল, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোমার ফাটফাটিতে উড়ে যেতে হলেও কি আর তাকে ঘর-ছাড়া করা উচিত ?

এই ধরনের ভাবনাই সুধা ভাবে,—সম্পূর্ণ অন্যভাবে। সে এমন ভীরু আর চালাক মেয়ে যে আরও কয়েকটা বছর গোপালের দিনান্তের কর্মান্তিক অবসাদের সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য সে বজায় রাখবেই। এখনও স্নায়বিক দুর্বলতা সে পছন্দ করে না। এখনও হিস্টিরিয়াকে সে ঘেন্না করে। কারণ সুধার স্নায়ু এখনও বড় দুর্বল। মাঝে মাঝে এখনও তার হিস্টিরিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু তো একদিন সবল হবে ? হিস্টিরিয়া তো একদিন সেরে যাবে ? নিজমূর্তি ধারণ করলে কি বিপদটাই না জানি তখন তার হবে !

পৃথিবীর আর কোনো জীবন্ত প্রাণী বাঁচুক মরুক কিছুই তার এসে যায় না এমনভাবে সুধাকে গোপাল ভালোবাসে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে নৈতিকনীতি পর্যন্ত চুলোয় পাঠানো যায় এমনভাবে গোপাল সুধাকে ভালোবাসে। তবু সুধার ভয় আর চালাকির শেষ নেই। অবার যদি গোপাল পৃথিবী পাক দিতে চলে যায় ? কিছুতেই মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলছিল না বলে কথাটা বলাবার জন্য একজনের কাছে আত্মসমর্পণের ভান করায় কুমারী অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে সাত বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে আর ভানটা কার্যে পরিণত করা সত্ত্বেও সাত বছর পরে ফিরে এসে সেই আর-একজনের বিধবা অবস্থায় পেয়েও তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে যে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। একা সে তাকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারবে না। সে জন্য ছেলেমেয়ে চাই।

যে দুটি ছেলে তার আছে, তারা নয়। গোপালের নিজের ছেলেমেয়ে।

ছেলে সুধার হলো,—পরপর তিনটি। স্নায়বিক দুর্বলতাও সুধার কমে গেল, হিস্টিরিয়াও বিদায় হলো। কিন্তু দুই আর তিনে যে পাঁচ হয় এই হিসাবটাই তাকে করে রেখে দিল কাবু। পরপর পাঁচ ছেলে কোলে পাওয়া যেকোনো মেয়েমানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার,—অদ্ভুত অকথ্য রহস্য। মেয়ে কই? কেন মেয়ে হয় না তার? গোপাল ছাড়া এ-জগতে কার কাছে কবে সে কি অপরাধ করেছে যে তার মেয়ে হয় না,—হয়তো হবে না?

এবারও যদি ছেলে হয়?

টের পাওয়ার একমাসের মধ্যে সুধা দুর্ভাবনায় শুকিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ নয়, অন্য কিছু, এরকম হয়, ভাবনার কিছু নেই, টনিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করতে পারলে—

সুধা রাগ করে বললে, 'চেঞ্জ না হাতি। ছুটি তো তোমার একদিনও পাওনা নেই, কার সঙ্গে যাব?'

'তোমার দাদার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে রেখে দাদার সঙ্গে চেঞ্জে যাব—অত শখে আমার কাজ নেই।'

পাঁচবার স্বাস্থ্য ভালো ছিল, পাঁচবার ছেলে হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য এবার যদি মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভালো করার চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে? সুধা টনিকও খেল না, চেঞ্জেও গেল না, খারাপ শরীর খারাপ করেই রেখে দিল। এমনকি, বেশিরকম চুল উঠে যেতে আরম্ভ করায় চুলের সঙ্গে জীবনটাই যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল বটে তবু চুলের জন্য পর্যন্ত টনিকের ব্যবস্থা করল না।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবারও যদি ছেলে হয়?'

গোপাল উদাসভাবে বলল, 'হলে হবে।'

খানিকটা ঝিমিয়ে সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এমন কি কোনো উপায় নেই, যাতে লোক ছেলে চাইলে ছেলে পায়, মেয়ে চাইলে মেয়ে?'

গোপাল হঠাৎ সচেতন হয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ব্যাপারটা কি শুনি? তোমার হয়েছে কি?'

সুধা রেগে বলল, 'ব্যাপার পরে শুনো, আগে যা বললাম তার জবাবটা দিয়ে নাও।'

জবাব গোপাল কি দেবে? এ তো জীবন্ত প্রশ্ন নয় যে মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবার পর অনেককাল কেটে গিয়েছে বলেই জবাব একটা আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে,—জীবনের এ একটা সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ কৌতূহল। গোপাল তাই চিরন্তন যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হয়তো উপায় আছে, মানুষ তা জানে না।'

মানুষ কেন জানে না এরকম কুটিল প্রশ্ন করার মতো জটিল মনোবিকার সুধার জন্মে নি, সে তাই বিনা প্রতিবাদে প্রতিদিন রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রোগা হতে হতে মাস দেড়েকের মধ্যে এমন রোগাই হয়ে গেল যে জন্মাবার আগেই মেয়েটি তার গেল মরে।

সুধা কেঁদেই অস্থির। হায়, মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে মেয়েকেই সে হারিয়ে বসল! মাথা খারাপ না হলে মেয়ে কি না জানার আগে মেয়ে নয় মনে করে মানুষ এমন ব্যাকুল হয়? কদিন খুব কাঁদাকাটা করে সুধার মন শান্ত হবার আর স্নায়ু অবসন্ন হবার সুযোগ পেল। তার ফলে ধীরে ধীরে এল স্থায়ী বিষাদ, যা অনেকটা পরিতৃপ্তির সামিল।

পরের বার একটি মেয়ে হলো সুধার। অনেকদিন পরে— প্রায় চার বছর।

এইখানে উনিশ বছরের ছেদ দেবার সুযোগে সুধার মেয়ে হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বোমা ফাটাফাটি সম্পর্কটা সংক্ষেপে একটু

ব্যাখ্যা করি। এটা অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত কিন্তু সেজন্যে কিছু এসে যায় না। দুয়ে আর দুয়ে যে যুক্তিতে চার হয়, দু-লাখে আর দু-লাখে সেই যুক্তিতেই হয় চারলাখ। তুলনামূলকতার ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো বিস্ময়কর অসত্য নেই,—অতি সহজ কথা। এ-যুগের চরম আর পরিণত দৃষ্টান্ত হিসাবে না ধরে সুধাকে ছেঁটে-কেটে যদি সে যুগের মৌলিক আর অপরিণত দৃষ্টান্তে দাঁড় করানো হয়, তবু দেখা যাবে, এই সুধার এভাবে মেয়ে হওয়ার মতো সেই সুধার অতি সামান্যরকম এভাবে মেয়ে হওয়ার জন্যই মানুষের দাঁত আর নখে বোমার রক্তপিপাসা জেগেছিল। নখের আঁচড় আর বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে যে পার্থক্য নেই, এই ধারণা পোষণ করাই প্রত্যেকের উচিত। তা না হলে তুলনামূলক ঘোরপ্যাঁচের ফাঁদে পড়ে মানুষ তর্ক আর হাতাহাতি করে,—কোনো সময় নখ দিয়ে আঁচড়ায় আর দাঁত দিয়ে কামড়ায়, কোনো সময় এক ঝাঁক এরোপ্লেন পাঠিয়ে বোমা বৃষ্টি করায়।

মন্দা একদিন সুধাকে বলল, 'মা আজ বাড়ি থেকো, সন্ধ্যেবেলা অনাদি আসবে। বাবাকে বলতে পারবে না, তোমায় বলবে। তুমি বাবাকে বোলো।

সুধা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বলল, 'অনাদি ? তাই তো।'

মন্দার মুখ গম্ভীর হলো, চোখবড় হল, দৃষ্টিতে তরিতা এল। ভীরু মাকে একটি আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তুমি ভাবছ এখনো আমি কচি খুকিটি আছি, না ? কিছু বোঝো না, কেন ভেবে মরো, কি দরকার তোমার এত ভাবনার ? কাল সন্ধ্যেবেলা সমীর আসবে—আসতে বলেছি।'

সুধার বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাগুলি সরল হতে আরম্ভ করায় ভয় পরিণত হয়েছে বুকের ধড়ফড়ানিতে আর চালাকি পরিণত হয়েছে প্রায় নিবুদ্ধিতায়। কিছুই যেন

সহজে বোধগম্য হয় না। গল্পের মাঝখানে আমার গল্প ব্যাখ্যা করার মতো মন্দাকে তাই আবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয়।

'আমি ওপরে থাকব। সমীর এলেই অনাদির কথাটা বলবে—বেশ হাসিমুখে বলবে, তোমাদের যেন মত আছে এমনিভাবে, বুঝলে? তারপর সমীরকে ওপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে?'

সুধা কাতরকণ্ঠে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস মন্দা? আজ অনাদি, কাল সমীর—এসব কোনদেশী কাণ্ড?'

সুধার তখনকার মুখ দেখেই যেকোনো বুদ্ধিমতীর রাগ করার কথা, তবু সুধার কথা শুনেই যেন হঠাৎ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা খেয়াল করে মন্দা একেবারে ঝিমিয়ে গেল। গোম্ভীর মুখ ম্লান হলো, বড় চোখ স্তিমিত হলো, দৃষ্টি ভিজে এল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'কেন ভাবছ তুমি? ভেবো না। সমীরের জন্যেই তো—না বলালে কোনোদিন মুখ ফুটে বলবে ভেবেছ?'

ব'লে সুধাকে হাত ধরে বসিয়ে তার পাশে বসে কোলে মুখ গুঁজে মন্দা আরম্ভ করে দিল কান্না। সুধার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আহা, সমীরের জন্য মেয়ে যখন তার এমন করে কাঁদছে, সমীরকে নিয়েই সে তার নীড় বাঁধুক। কি আসে যায় একটু যদি একগুঁয়ে মানুষ হয় সমীর, অনাদির সঙ্গে কবে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বলে মেয়েকে যদি এতকাল একটু পীড়ন করেই থাকে সমীর? সব ভালো যার শেষ ভালো।

তোমরা সবাই ভালো

আঠার মিনিট লেট! সারারাত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কলকাতা পেঁছুতে আঠার মিনিট লেট করে গাড়িটা কি অমার্জনীয় অপরাধ তার কাছে করেছে!

দিবাকরবাবুর বোন সুবালা জিজ্ঞেস করল, 'গাড়িতে ভীড় ছিল না?'

'ভীষণ ভীড়। কোনোমতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছিলাম।

'সুবালা ভাবল, ছেলেটা কি মিথ্যাবাদী! সারারাত গাড়িতে জেগে বসে এলে কারো এমন তাজা চেহারা থাকতে পারে!

'সারারাত ঘুমোওনি বুঝি?'

'ঘুমিয়েছি। আমার এই বাক্সে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি একেবারে নৈহাটি পেঁছে গেছি।'

স্টীলের ফোঁড়ায় কণ্টকিত তার ট্রাঙ্কটির দিকে তাকিয়ে কেবল সুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল। ট্রাঙ্কের ওপর বিছানা পেতে নিয়েছিল নিশ্চয়? কিন্তু বিছানা কই রমেনের? সঙ্গে তো শুধু একটা সতরঞ্চি!

'আমি তো তোষক বালিশে শুই না। চৌকিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে নিই। শক্ত বিছানায় শোয়া খুব উপকারী পিসিমা।'

পিসিমা? কাকে সে পিসিমা বলছে?

'আমি তোমার পিসিমা নই।' সুবালা প্রতিবাদ জানাল।

'পিসিমাই হন আপনি।' রমেন মৃদু মৃদু হাসছে

'আমি তোমার এই পিসেমশায়ের বোন—ছোট বোন।' সুবালা দিবাকরবাবুকে দেখিয়ে দিল। 'তোমার পিসিমা রান্নাঘরে আছেন।'

মনে মনে সুবালা ভীষণ চটে গেল। কোথাকার হনুমান ছেলে! দিবাকরবাবুর বয়স ষাট হতে চলল, রমেনের পিসিমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আর তাকে সে মনে করে বসল পিসিমা, বয়স তার এখনো সাতাশ হয়নি! চোখে না দেখে থাকলেও এটুকু তো তার জানা আছে যে তার পিসিমার বড় ছেলেটার একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি, তার পিসিমার এখন ঠাকুরমা পদবি!

রমেন বলল, 'এই পিসিমার সম্পর্কে আপনাকে পিসিমা বলিনি। নন্দ পিসেমশায়ের সম্পর্কে আপনি পিসিমা হন।'

শুনে কেবল সুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই থ বনে গেল। সকলের মনে পড়ল, সত্য সত্যই রমেনের সঙ্গে সুবালার দু-দিক থেকে সম্পর্ক আছে, সে তার এক পিসেমশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দিবাকর অনেক অনেক দূর সম্পর্কের পিশেমশায়, কিন্তু প্রথমে রমেনের বাবার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলে সুবালার স্বামী নন্দগোপাল তার খাঁটি মাসতুতো পিসেমশায়। ছেলেটা তবে ভুল করেনি, সুবালাকে জন্মে কখনো চোখে না দেখে থাকলেও সে যে কে, মনে মনে আন্দাজ করে তার সঙ্গে ডবল সম্পর্কের মধ্যে কোনটা বেশি লাগসই তাও স্থির করে ফেলেছে। এতো যেমন-তেমন ছেলে নয়!

ইতিমধ্যে দিবাকরবাবুর স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। মানুষটা তিনি রোগা এবং লম্বা, মুখখানা বদমেজাজী। চশমার ভেতর দিয়ে রমেনকে নিরীক্ষণ করে তিনি যথাবিহিত স্নেহার্দ্র বিস্ময়ের ভদ্রতা করে বললেন, 'ওমা, তুমি চারুদাদার ছেলে?'

রমেন বলল, 'বাবাকে আপনি দাদা বলেন পিসিমা? আমি শুনেছিলাম বাবা আপনার চেয়ে ছোট।'

পিসিমা ঢক্ করে একটা ঢোঁক গিলে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলি।' তারপর প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

রমেনের প্রণাম গ্রহণের জন্য গুরুজনেরা প্রস্তুত হয়ে এতক্ষণ

অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন প্রণাম করার কথাটা বুঝি তার মনে নেই। রমেন জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করায় সুবালা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'পিসিমা পিসেমশাইকে প্রণাম করো রমেন।'

'আমি তো কাউকে প্রণাম করি না, ছোট পিসিমা?'

'প্রণাম করো না!'

'প্রণাম করা ছেড়ে দিয়েছি।'

এমনভাবে রমেন কথাটা বলল, যেন একটা তার বদ অভ্যাস ছিল, খুব মনের জোর দেখিয়ে অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে। সুবালা আর পিসিমা বাক্যহারা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিসিমার সেজ মেয়ে রানী খিলখিল করে হেসে উঠেই বিবর্ণ হয়ে চুপ করে গেল। দিবাকরবাবু ঘরে আছেন ভুলে গিয়ে সে হেসে ফেলেছিল। বাড়িতে বিশেষ করে তার সামনে, কারো শব্দ করে হাসাটা দিবাকরবাবু পছন্দ করেন না। অন্য সময় হয়তো তিনি হাসি বন্ধ করা সত্ত্বেও রানীকে ধমক দিতেন, এখন নবাগত ছেলেটার চমকপ্রদ পাকামিতে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ায় মেয়েকে শাসন করতে বোধহয় ভুলে গেলেন। যতবড় বেয়াদব হোক, বাড়িতে যে পা দিয়েছে মোটে পাঁচ মিনিট, তার ওপর গর্জন করে ওঠা উচিত নয় ভেবে আত্মসম্বরণের অতি কষ্টকর চেষ্টায় কাতর হয়েই সম্ভবত তিনি হঠাৎ ধপ্‌ করে চৌকিতে বসে পড়লেন। চৌকিটা কচ্‌মচ্‌ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল। দিবাকরবাবুর দেহটি প্রকাণ্ড, চুলে পাক ধরলেও গায়ে তার এখনো অসম্ভব জোর। এই কদিন আগে তার বিরাট থাবার থাবড়া খেয়ে মেজছেলে সুকান্ত ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সকলের মুখের ভাব দেখে রমেন কি বুঝল সে-ই জানে, ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'তাই বলে গুরুজনদের ভক্তি করি না ভাববেন না কিন্তু ছোট পিসিমা। মানুষের পায়ে কত ধুলোবালি ময়লা লাগে, পায়ে হাত দেয়া উচিত নয় বলে

প্রণাম করি না। বাবাও তাই বলেন। গুরুজনকে ভক্তি করি, পায়ের ময়লাকে তো ভক্তি করি না। একজনের পা থেকে ময়লা নিয়ে নিজের কপালে লাগানোর কোনো মানে হয়?'

দিবাকরবাবু আর সামলাতে পারলেন না, সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন, 'মানে বুঝেছি। তুমি একটি এক নম্বরের জ্যাটা ছেলে। যা, ওঘরে যা।'

রমেন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, এক-পা দিবাকরবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাগ করলেন পিসেমশাই?'

দিবাকরবাবুও নির্বাক বিস্ময়ে একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চৌকি ছেড়ে উঠে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন আপনমনে বলল, 'পিসেমশাই রাগ করেছেন।'

সে যেন বুঝতে পারছে না কেন দিবাকরবাবু রাগ করলেন, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না দিবাকরবাবু সত্য সত্যই রাগ করেছেন।

বেলা তখন প্রায় এগারটা বাজে। রমেনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও ছিল না। লোক তো বাড়িতে কম নয়, নাওয়া-খাওয়ার হাঙ্গামাও তাদের সহজ নয়। তাছাড়া আশ্রিত হিসাবে বাড়িতে থাকবার জন্য যে এসেছে তাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হবার গরজই বা হবে কার।

রমেনের ট্রাঙ্কটা বৈঠকখানা থেকে ভেতরের একটা ঘরে নিতে সাহায্য করে সেই যে চাকরটা কোথায় গেল, আর তার পাত্তা নেই। দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় সুবালা একবার রমেনকে চান করে নিতে বলে গেল, আর কেউ খবর নিতে এল না। ঘরটা বেশি বড় নয়, দুটি চৌকি একটি টেবিল আর দু খানা রঙ-করা লোহার চেয়ার আছে। দুটি চৌকিতেই বিছানা গুটানো আছে। একটি সুকোমলের, অন্যটি দিবাকরবাবুর ছোট ভাই সুধাকরবাবুর শালা রঞ্জিতের। টেবিলের একপাশে আই. এ ক্লাসের বই, বাকি অংশ জুড়ে স্কুলের নিচু ক্লাসের ইংরাজি বাংলা অঙ্কের মলাট-ছেঁড়া বই আর খাতা ছড়ানো। দেয়ালে বসানো কাঠের তাক

দুটিতে ঘুড়ি-লাটাই, মার্বেল, রবারের বল, টিনের কৌটা, কাগজের বাক্স থেকে শুরু করে পালিশ-চটা জুতো পর্যন্ত কি যে নেই বলা কঠিন। সুকোমল আর রঞ্জিত এ-ঘরে থাকে এবং বাড়ির গন্ডা-দেড়েক ছেলে মেয়ে দুবেলা এ-ঘরে বসে নকুল মাস্টারের কাছে পড়াশোনা করে।

সুকোমল সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে দু চারটি কথা বলার চেষ্টা করে রমেন সুবিধা করতে পারল না। কাটা-কাটা জবাব দিয়ে সুকোমল কুটিল চোখে তাকে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল। রমেন যখন ট্রাঙ্ক খুলে তার বই আর কাপড় বার করছে, হঠাৎ সে চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় ওপরে ভালো ঘরে থাকতে দেবে।'

'ঘর খালি নেই নিশ্চয়।'

'নেই? দেখে এসো না আছে কি'না। দোতলায় আছে, তিনতলায় আছে। সব বড়মামার নিজের লোকের দখলে—এক-একজনের এক-একটা ঘর! খাটে না শুলে বড়মামার ছেলেমেয়ে-দের ঘুম আসে না।'

'খাটে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো।'

সুকোমল ফোঁস করে উঠল, 'আমরা কেন নিচের স্যাঁতসেঁতে ঘরে গাদাগাদি করে থাকব?'

'পিসেমশায়ের ভাইও তো নিচের তলায় থাকেন ভাই।'

'সাধে থাকেন? বাত নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে। ছোটমামীরা ওপরে থাকেন।' রাগে অভিমানে সুকোমলের মুখ-খানা বাঁকা দেখায়, 'এই তো সবে এলে। দু-দিন থাকো, টের পাবে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। বাড়িতে থাকতে দিয়েছে তাই যেন ঢের!'

রমেন একগাল হেসে বললে, 'ধেৎ, তাই কখনো হয়? খারাপ ব্যবহার যদি করবে, বাড়িতে থাকতে দেবার দরকার! মনে কষ্ট দেবার জন্যে কেউ কাউকে ইচ্ছে করে বাড়িতে রাখে নাকি?'

সুকোমল হতভম্বের মতো বলল, 'রাখে না?'

রমেন বলল, 'কেন রাখবে? একজনকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট হয়, মিছামিছি নিজে কষ্ট পাবে এমন বোকা কেউ নয় ভাই। আমরা জোর করে থাকতে আসতাম তাহলে বরং কথা ছিল। তা তো আমরা আসিনি। আমার কথা ধরো। বাবা পিসেমশাইকে লিখলেন আমি এখানে থাকতে পারব কি না, পিসেমশাই জবাবে আমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন। লিখলেন, কোনো অসুবিধে নেই। অনাদর করবার জন্যে আমাকে ডেকে আনার তাঁর কি দরকার ছিল? বাবাকে তাহলে লিখে দিতেন সুবিধে হবে না।'

কথা বলতে বলতে রমেন টেবিলে ছড়ানো বইগুলি গুছিয়ে ফেলেছে। বইখাতা সমস্ত টেবিল জুড়ে ছিল, এখন দেখা গেল টেবিলে অনেক জায়গা। তাকের জঞ্জালগুলি সরিয়ে নামিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে জায়গা খালি করতে করতে রমেন হঠাৎ বলল, 'তুমি ওপরের ঘরে থাকবে ভাই? আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

রমেন ব্যবস্থা করে দেবে! সেই যেন বাড়ির কর্তা! সুকোমল চটে গিয়ে একটা ব্যঙ্গোক্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হলো রমেন বাহাদুরি করেনি, ওপরে তার থাকবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতায় নিজের বিশ্বাসটা শুধু প্রকাশ করেছে।

'আমার দরকার নেই—।' সুকোমল জবাব দিল।

এগারটা পর্যন্ত নিচের তলায় কোনোরকম গোলমাল ছিল না, তারপর এমন হৈচৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল যেন হাট বসেছে।

সুকোমল বলল, 'বড়মামা ওপরে গেলেন।'

এ-বাড়িতে দিবাকরবাবুর প্রচণ্ড শাসন কেবল তার নিজস্ব সুখসুবিধা আর জ্বালাতন হওয়া না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চোখ আর কানের আড়ালে কি ঘটছে না ঘটছে সে-বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাঁর সামনে সবাই ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করবে, জোরে কথা বলবে না, হাসবে না, ছেলেমেয়েরা

পর্যন্ত চেঁচামেচি দুরন্তপনা বন্ধ রাখবে—এইটুকু হলেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই, তিনি একতলায় নামলে দোতলা হাঁফ ছেড়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, দোতলায় উঠে গেলে একতলায় শুরু হয় চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। বড়রা অবশ্য মারামারিটা করে না, সেটা ছেলেমেয়েদের একচেটিয়া হয়েই থাকে, বড়রা শুধু তাদের মারে। যখন-তখন যার যাকে খুশি হরদম মারে। মনের মধ্যে সকলে যেন কি জ্বালা পুষে রেখেছে, ছোটদের ওপর কারণে-অকারণে ঝাল না ঝেড়ে থাকতে পারে না।

নিজের বইখাতা গুছিয়ে রমেন একা ঘরে বসে আছে। সুকোমল বলেছিল, সারাদিন না খেয়ে ঘরে বসে থাকলেও কেউ আর তাকে ডাকতে আসবে না। রমেন তা স্বীকার করেনি এবং তার ভুল ধারণা ভেঙে দেবার জন্য তাকে নাইতে পাঠিয়ে নিজে প্রতীক্ষা করছে। তেল মেখে গামছা হাতে সে একেবারে তৈরি হয়ে আছে, দু-চার মিনিটের মধ্যেই যে সাদর আহ্বান আসবে তাতে যেন তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সত্য সত্যই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে এলেন। ঠিক নাইতে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে নয়, পরিচয় করতে। রমেনের বেয়াদবির গন্ধ ইতিমধ্যেই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে উপন্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মনোরমা এতক্ষণ তাই শুনছিলেন। দিবাকরবাবুর স্ত্রী অনুপমা আর সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা এই দুটি জায়ের মনের গতি সর্বদাই পূব আর পশ্চিমের মতো পরস্পর বিরোধী। একজন লালপাড় শাড়ি পরলে অন্যজন পরেন কালোপাড় শাড়ি, একজন রুইমাছ খেলেপরে অন্যজন খান কৈ মাছ, একজন কারো নিন্দে করলে অন্যজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। একজনের কোনো ছেলে বা মেয়ে পর্যন্ত যদি অন্যজনের একটু বেশি আদর পায়, নিজের সেই ছেলে বা মেয়েকে ধরে তার মা আচ্ছা করে পিটিয়ে দেন। এখন, রমেন যখন আজ এল, মনোরমার কাছে সংবাদ ঠিকমতোই পেঁছেছিল

কিন্তু অনুপমা তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন বলে তিনি তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাওয়াও উচিত মনে করেন নি। তারপর অনুপমা যখন তীব্রভাবে রমেনের নিন্দে শুরু করলেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে দিলেন যে, বাড়ির ছেলেদের মাথা খাবার জন্য এ-শনিগ্রহকে তিনি বাড়িতে জায়গা দিতে পারবেন না, দু'চারদিন দেখে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবেন, তখন মনোরমার মনে হলো এই তেজী, সুবিবেচক, আদর্শচরিত্র ছেলেটির সঙ্গে তো অতি অবশ্য তার ভাব করা দরকার! ঘরে ঢুকেই তাই হাসিমুখে অত্যন্ত মিষ্টি সুরে বললেন, 'একলাটি বসে আছো বাবা? বাড়ি ছেড়ে এসে মন কেমন করছে?'

রমেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

মনোরমা একটু ভড়কে গেলেন। এত বড় ধাড়ি ছেলের মুখে এমন ধারা জবাব কি শোভা পায়? বাড়ির জন্য মন কেমন করার অভিযোগ রমেন অস্বীকার করলে তিনি তাকে কি বলবেন মনে মনে তাই মনোরমা ঠিক করে রেখেছিলেন, চার-পাঁচ বছরের ছেলের মতো সে সহজ সরল জবাব দিয়ে বসায় তাকে এবার কি বলবেন খানিকক্ষণ তিনি ভেবেই পেলেন না। বোকা হাবা নয়তো ছেলেটা? মাথার কোনো দোষ নেই তো?

সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের অনভ্যস্ত ধাক্কা সামলে মনোরমা তারপর বললেন, 'প্রথম দু-চারদিন ওরকম লাগবে বাবা। তা আমরাও তোমার পর নই। আমি হলাম গিয়ে তোমার—'মনোরমা থমকে থেমে গেলেন। তিনি রমেনের কে হন? দূর সম্পর্কের পিসিমার জা-এর সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়?

'আপনি আমার ভালো পিসিমা।'

পিসিমা? তাই বটে, রমেনের পিসিকে তিনি যখন দিদি বলেন, তিনিও রমেনের পিসিমা হন বটে। কিন্তু ভালোপিসিমা কেন? ছোট, বড়, মেজ, সেজ, রাঙা, কালো মাসি পিসি দিদি বৌদি শুনেছেন, ভালোপিসিমা তো শোনেন নি কখনো! তিনি

কি ভালো ? রমেন কি দেখেই চিনেছে তিনি মানুষটা মন্দ নন, মন তার ভালো ? মনোরমা একটি বিস্ময়কর আনন্দ অনুভব করেন। অনেকদিন ধরে মনের ওপর যেন একটা ভার চাপানো ছিল, ভারটা হালকা হয়ে গেছে। কতকাল ধরে শুনে আসছেন তিনি হিংসুটে, স্বার্থপর, ঝগড়াটে এবং আরও অনেক কিছু। শুনতে শুনতে ধারণা জন্মে গেছে যে তিনি সত্যই তা-ই। হিংসা, স্বার্থপরতা আর ঝগড়াঝাটি নিয়েই দিনও তার কাটছে বৈকি। রমেনের কথা শুনে হঠাৎ মনে হলো, ওসব কিছু নয়, অনেককাল আগে অল্পবয়সে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন,—সাদাসিধে ভালোমানুষ। তিনি ভালো।

কাছে বসিয়ে আদর করে মনোরমা রমেনকে খাওয়ালেন। অনুপমার পিত্তি জ্বালিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, খাসা ছেলে দিদি। ছেলেমেয়েদের একটিবার ধমক দিলেন না, কারো দিকে কড়া চোখে তাকালেন না, ছেলেবুড়ো চাকর-দাসী প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইলেন হাসিমুখে। মনে হতে লাগল, খোলস ছেড়ে মনোরমা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। খাওয়ার পর তিনিই রমেনকে বললেন, এইটুকু ঘরে কি তিনজনের জায়গা হয় ? তুমি ওপরে থাকবে রমেন ?'

তখন রমেন বলল, 'ভালোপিসিমা, আমি এ ঘরে থাকি, সুকোমলকে ওপরে নিয়ে যান।'

মনোরমা হেসে বললেন, 'এ ঘরে থাকতে চাও তুমি ? বেশ বাবা তাই হবে। সুকোমল ধীরেনের ঘরে যাক্, তুমি এখানেই থাকো।'

এ-ব্যবস্থায় খুশি হওয়ার বদলে সুকোমল কিন্তু ভয়ানক চটে গেল। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগল কিনা। এতদিন বাড়ির লোকের উপেক্ষায় তার অভিমানের সীমা ছিল না, আজ তাদের পক্ষপাতিত্বে সে হিংসায় পুড়তে লাগল। তাকে কেউ গ্রাহ্যও করে না, রমেনের মুখের কথায় তার দোতলায় ভাল ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাড়িতে পা দিয়েই ছেলেটার এতখানি প্রতিপত্তি

জন্মে গেছে ?

কৃতজ্ঞতা বোধ করার বদলে রমেনের বিরুদ্ধে সে তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, উপকার করার বদলে রমেন তাকে ভীষণ অপমান করেছে। মনটা তার আরও বেশি খিচড়ে গেল, ওপরের ঘরে যেতে একান্ত অনিচ্ছা জানাতেও কেউ যখন তার কথা কানে তুলল না, ধমক্ দিয়ে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দোতলায়।

কেবল সুকোমল নয়, অনুপমারও এমন রাগ হলো বলবার নয়। একে তো প্রথমেই রমেনের ব্যবহারে তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তার ওপর তার সম্পর্কে তার বাড়িতে এসে মনোরমার দলে ভিড়ে তাকে যে অপমানটা সে করল, তার জ্বালা চেপে রাখতে গিয়ে গায়ে জ্বর আসার মতো শিউরে উঠতে লাগলেন। মুখে যাই বলুন, দু-দিন দেখে সত্যি সত্যি কি আর রমেনকে তিনি তাড়িয়ে দিতেন ? এখন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, তেরাত্রি পোয়ানোর আগে ছোঁড়াটাকে তিনি বিদেয় করবেন, কান্ড করে ছাড়বেন একটা। তাকে ডিঙিয়ে তার ভাইপোকে ছোট-বৌ কিসের জোরে দখল করে, তাও দেখে নেবেন।

দুপুরবেলা একবার মনোরমার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে রমেনের সঙ্গে তাকে গল্প করতে দেখে অনুপমার চশমা-পরা চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হলো।

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, না, আগে রমেনকে বাড়ি থেকে তাড়ানো হবে না। আগে শিক্ষা দিতে হবে ছোট-বৌকে। রমেনকে বশ করে ওকে দিয়ে অপমান করতে হবে। ডাকলে রমেন ছোট-বৌয়ের কাছে যাবে না, কথা বললে শুনবে না, অবজ্ঞা দেখাবে, অপমান করবে—এই যদি করতে পারেন, তবেই অনুপমার বেঁচে থাকা সার্থক।

রমেনকে দেখেই সকলের মনে যে একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল সেটা একেবারেই অমূলক নয়।

ছেলেটাকে আয়ত্ত করা একরকম অসম্ভব। তাকে স্নেহ করার খাতির করার, খুশি করার, আঘাত দেওয়ার কোনো প্রচলিত পদ্ধতি কারো জানা নেই। নিজে থেকে কাউকে সে এড়িয়ে চলে না, কারো সঙ্গে বেশি খাতির জমানোর চেষ্টা করে না, একজনকে ছোট করে আরেকজনকে বড় করার এতটুকু উৎসাহও তার নেই। বেশি বেশি আদর যত্ন স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে বশ করা যেমন অসম্ভব, অবজ্ঞা করে নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে তাকে কাবু করাও তেমনি অসম্ভব। মমতা আর অবহেলার দাম তার কাছে যেন সমান। কয়েকদিনের মধ্যে তার ব্যাপার দেখে অনুপমা আর মনোরমা দু-জনেরই ধাঁধা লেগে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের দু-জনের মধ্যে কেউ রমেনের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব অর্জন করতে পারলেন না। কিশোর সন্ন্যাসীর মতো সে যে একেবারে নির্বিকার হয়ে থাকে তা নয়, ভালোবাসা দেখালে শিশুর মতো খুশি হয়ে ওঠে, কিন্তু গলে পড়ে না। ভালোবাসা দেখানোর আগে যেমনটি ছিল পরেও তেমনি থাকে। লেজও নাড়ে না, পাও চাটে না!

প্রথম দিন অনুপমা ভেবেছিলেন, মনোরমা আগেই ভাব আরম্ভ করেছে, তার সঙ্গে তিনি বোধহয় পাল্লা দিতে পারবেন না। বিকালে মিষ্টি আনিয়ে লুচি ভেজে রমেনকে খেতে দিলেন। অন্য সকলেই অবশ্য লুচি আর মিষ্টি খেল, কিন্তু তার মিষ্টি কথাগুলি পেল শুধু রমেন। পুলকিত হয়ে অনুপমা লক্ষ্য করলেন, এ-বাড়িতে তাকেই যেন সে আপন মনে করে, তার স্নেহ আর যত্নই যেন সে চায়, এমনি ভাব রমেনের। নতুন পরিচয়ের সঙ্কোচ নেই, পর মনে করা নেই। কি আগ্রহের সঙ্গেই রমেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই প্রাইজগুলি আছে পিসিমা? দেখাবেন আমায়?'

কবে সেই অল্প বয়সে সেলাইয়ের কাজ আর গানের জন্য অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন, বাপের কাছে শুনে সেগুলি দেখবার জন্য রমেন উৎসুক হয়ে আছে। মনটা অনুপমার কেমন করে উঠল। কই, দশবিশ বছরের মধ্যে কেউ তো কোনোদিন জানবার

আগ্রহ দেখায়নি তার এককালে বিশেষ কি গুণ ছিল, কিসের জন্য বাড়িতে আর পাড়াতে এককালে তিনি সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতেন! আজ আড়ালে লোকে তাকে শুঁটকি মাছ বলে, তার মাথায় নাকি ছিট আছে, সাদা চোখে তাকালে ছেলেপিলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে বলে তিনি নাকি চশমা পরে থাকেন! সত্যই কি তিনি এইরকম মানুষ? বড় ট্রাঙ্কের তলা থেকে খুঁজেপেতে পুরানো দিনের প্রাইজগুলি দেখাবার সময় রমেনের চোখভরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দেখে তো তার মনে হচ্ছে আজও তিনি সেই আগের অনুপমার মতোই আছেন, যার হাসিখুশি ভাব আর মিষ্টি স্বভাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত, পাড়ার মেয়ে-বৌ ভিড় করে যার কাছে আসত সেলাই শিখতে আর গান শুনতে।

অনুপমা স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন ভেতরটা তার অনেক-দিন শুকনো হয়ে ছিল, আজ হঠাৎ একটা মধুর রসালো আবেগে ভিজে সরস হয়ে উঠেছে। ঠিক এইরকম মনের অবস্থা ছিল বলে সন্ধ্যার পর মনোরমার ঘরে রমেনকে দেখে রাগ হবার বদলে তার খুব অভিমান হয়ে গেল। খানিক পরেই রানীকে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে উদাসভাবে বললেন, 'আমার নিন্দে শুনতে বেশ ভালো লাগছিল, না বাবা? আমি তো মন্দ আছিই—'

'না, পিসিমা।'

অনুপমা কাতর হয়ে বললেন, 'তুমি কি জানবে, সবাই আমায় মন্দ বলে। যার জন্যে যত করি তার কাছে আমি তত মন্দ।'

রমেন হেসে ফেলল। অনুপমা যেন হাসির কথা বলেছেন এমনিভাবে হেসে ফেলল। —'কেউ মন্দ বলে না পিসিমা। আপনি কেন মন্দ হতে যাবেন? ভালো-পিসিমা নিন্দে করেননি দুঃখ করছিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালোবাসতেন ভালো-পিসিমাকে, এখন আর বাসেন না। শুনে আমি কি বললাম জানেন?'

'কি বললে?'

'বললাম, তা নয় ভালো-পিসিমা, পিসিমার শরীর ভালো নেই। তাই আগের মতো আদর যত্ন করতে পারেন না। সত্যি নয়?'

সত্যি নয় আবার! আজ কতকাল ধরে কত অসুখে ভুগছেন পিসিমা, কে তার খবর রাখে! কে তাকিয়ে দেখে তার দিকে, তিনি মরলেই বা কার কি এসে যায়। সংসারের জন্য উদয়াস্ত তিনি খেটে যাবেন, সকলের ভাবনা ভেবে জর্জরিত হবেন, তাহলেই সবাই খুশি। কিন্তু এ ছেলেটার দয়ামায়া আছে, দেখেই বুঝতে পেরেছে তার শরীর ভালো নয়।

'ছোট বৌ কি বললে?'

'বললেন স্বর্ণসিন্দুর খেলে আপনার উপকার হবে। ওঁর এক মামা কবিরাজি করেন, তার কাছে খাঁটি ওষুধ পাওয়া যায়, আনিয়ে দেবেন বললেন।'

অনেককাল পরে সেদিন রাত্রে হেঁসেলে খেতে বসে অনুপমা আর মনোরমার মধ্যে কিছুক্ষণ সুখদুঃখের গল্প হলো।

তারপর কাটল অনেকগুলি দিনরাত্রি। বাড়ির অসংখ্য সংঘর্ষ ছোট আর বড়, সামান্য ও সাংঘাতিক, যেন আপনা থেকে উপে যেতে লাগল অতীতে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল বাড়িতে।

সবাই ভাবতে লাগল, আমি ভালো। আমি কেন খারাপ হতে যাব?

চুরি চুরি খেলা

দ্রষ্টব্য খুব বেশি অসাধারণ নয়, কিন্তু কমলার দেখিবার ভঙ্গিতে মনে হয় এ যেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অপূর্ব দৃশ্য।

মাঠের দক্ষিণে একসারি নিষ্কম্প নারিকেল তরু, মাঠের মাঝ-খানে পাতা-ঝরা একটি পেয়ারা গাছ, উত্তরে আমবাগানের জমাট শ্যামলতা এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া অর্ধচক্রাকার ইটবাঁধানো লাল পথ। পথের ধারে, ঘোষসাহেবের সাদা বাড়ির সামনে, টেলিগ্রাফ পোস্টে হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে। রায়বাবুদের জমাদার কিষণ প্রত্যহ দুইবেলা গাভীটিকে আনিয়া ওই পোস্টে বাঁধিয়া ঘোষসাহেবের চাকরের সামনে খাঁটি দুধ দুহিয়া দিয়া যায়।

নিকটে বাছুরটি দাঁড়াইয়া আছে, নিষ্কম্প, নিশ্চল,—বীভৎস। দু-মাসের বাছুরটি মানুষের সীমাহীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পনের দিন আগে মরিয়া গিয়াছিল, মানুষ তবু তাহাকে রেহাই দেয় নাই। চামড়া ছাড়াইয়া নিয়া ভিতরে খড় পুরিয়া কাঠের পায়ে সামনে দাঁড় করাইয়া প্রতিনিয়ত গাভীটিকে প্রতারণা করিতেছে।

নির্বোধ পশু মৃত্যু বোঝে না। ক্রমাগত চাটিয়া চাটিয়া সন্তানের নিথর অঙ্গে জীবনের সাড়া আনিবার চেষ্টা করে। এত-দূরে জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার গভীর কালো চোখের সকাতর চাহনি কমলা যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়। তার চোখ জ্বালা করিতে থাকে, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে কিষণকে অভিশাপ দেয়, মানুষকে ঘৃণা করে।

তার মনে পড়ে ফুকা নামক প্রক্রিয়ার কথা, গোরুর দুধ বাড়ানোর যে বীভৎস উপায়ের কথা কিছুদিন আগে সে শুনিয়াছে। কমলার মনে হয় মানুষ পারে না এমন কাজ নাই।

মাথা ঝিমঝিম করে কমলার।

কমলা এদিকের জানালায় সরিয়া আসে।

নিচে ফুলের বাগান, বাগানের শেষে ফল-বাগিচা। তাহার শেষপ্রান্তে বাদামী রঙের ঘর তিনখানা এ-বাড়িরই পরিসীমার অন্তর্গত। গাছের ফাঁক দিয়া ঘর তিনখানির দিকে কমলা শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

তার চোখ দিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

বারান্দায় জুতার শব্দ হয়।

স্বামীর পদশব্দ কমলা চেনে, তবু সে যেন চমকাইয়া ওঠে। ছিটকাইয়া গিয়া সে দরজায় খিল তুলিয়া দেয়।

ছোট ছোট নিশ্বাসের দোলনে তার অপরিপুষ্ট স্তনদুটিতে দোলা লাগে। কমলা ব্লাউজের বোতাম লাগায় না। লোকের সামনে শুধু শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়ায়।

দরজায় টোকা দিয়া খানিকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অনন্ত ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়। ঘরের মাঝখানে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা যতক্ষণ শোনা যায় কান পাতিয়া তাহার পদশব্দ শোনে।

তার চোখ ছলছল করে।

আজ কিন্তু অনন্ত ফিরিয়া গেল না। রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল, আমার সাড়া পেয়ে দরজা বন্ধ করলে যে? মুখ দেখবে না?

খুলচি।

খিল খুলিতে কমলার অনাবশ্যক সময় লাগিল। হাতে সে দু-গাছা শাঁখা পরিয়াছে, খিল খুলিবার সময় সরু রুলির পাশে শাঁখা দুটি কি চমৎকার মানাইয়াছে চোখে পড়ায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

অনন্তের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, সুঠাম চেহারা। শরীর দেখিয়া স্বাস্থ্যের অভাব অনুমান করা যায় না, চোখ দুটি কিন্তু তাহার সর্বদা ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। যারা হাইপাওয়ারের চশমা ব্যবহার করে, চশমা খুলিয়া রাখিলে,তাদের চোখ যেমন ঢুলুঢুলু দেখায়, তেমনি।

হাসিয়া বলিল, এ যেন আমার নিদ্রাপুরী কমলা। দুয়ার খুলেও খুলতে চায় না।

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

কমলার মুখ দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া অনন্ত বলিল, বিরক্ত করলাম ?

না।

কিন্তু মুখ দেখে যে মনে হয় বিরক্তির সীমা নেই! মনে হয়—

কি মনে হয় ?

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, মনে হয় এটা যেন জেলখানার সেল, আর তুমি তার কয়েদি। তোমায় জেল দিয়েছে হাকিম, কিন্তু নিরপরাধ জেলারকে দেখে রাগে চোখ লাল করে ফেলেছ।

কমলা মৃদুস্বরে বলল, রাগে নয়।

অনুরাগে ?

এই পরিহাসের জবাবে কমলা নীরব হইয়া রহিল। খাটের প্রান্তে বসিয়া তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত বলিল, ভূষণের অন্তর্ধান, বসনের বিদ্রোহ! এ শাড়ি তোমার কে এনে দিয়েছে শুনি ?

আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

এনে দিয়েছে কে ?

আমি আনিয়েছি।

আমি এনে দিইনি।

কে এনে দিয়েছে শুনবে ? সুশীলবাবু।

অনন্তের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

সুশীল ? ওকে বরখাস্ত করতে হবে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া অনন্ত গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিল।

কমলা বলিল, বরখাস্ত করতে হবে কেন ? আমার আদেশ পালন করেছে বলে ?

না। আমার আদেশ পালন করেনি বলে।

কমলা ম্লানভাবে হাসিল, ও! তবে বরখাস্ত করতেই হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অনন্ত বলিল, সুশীলের স্পর্ধা এত বেড়েছে কেন জানো কমল?

ওর ছেলেকে তুমি অতিরিক্ত আদর করো বলে।

কমলা উদাসভাবে বলিল, হবে! কিন্তু এ স্পর্ধা নয়। এতে আমি ওঁর বিনয়ের লক্ষণই খুঁজে পাই। কৈফিয়ত সৃষ্টি করছ কেন? দিও তুমি সুশীলবাবুকে বিদায় করে।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার চুরুটের ধোঁয়া পাক খাইতে খাইতে উপরে উঠিতে লাগিল; মন্থর গতি। এদের কলহও এমনি অলস, এমনি সংক্ষিপ্ত, এমনি ভীরু। কেহ রাগ করে না, ধৈর্য হারায় না, কড়া কথা বলে না। এই যে সামান্য একটু আলোচনা হইয়া গেল, ইহা শুনিয়া বাহিরের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, সুশীলকে বরখাস্ত করিতে না পারিলে অনন্ত বহুদিন ধরিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে, পারিলে তাহার জের কমলা সহজে মিটিতে দিবে না। কিন্তু ইহাদের অভিজ্ঞতা এমনি প্রচুর যে ভবিষ্যতের এই অতিরিক্ত দুর্গতির সম্ভাবনায় সন্দেহ করিবার সুযোগও পায় না। সুশীল থাক্ বা যাক, আজ হইতে দু-জনের সম্পর্ক আরও বৈচিত্র্যহীন আরও নীরস হইয়া উঠিবে, কমলা চট পরিয়া থাকিলে অনন্ত তাহা দেখিতে পাইবে না, অনন্তের কোনো কথায় মৃদুতম প্রতিবাদ করিতেও কমলা ভুলিয়া যাইবে!

কমলার চোখ জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। একি জীবন! আনন্দের অভাব শুধু নয়, নিরানন্দের প্রাচুর্য! অথচ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুল অনন্ত অনেক করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভুল নিন্দনীয়, কিন্তু পরমাত্মীয়ের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিতে তো খুব বেশি উদারতার প্রয়োজন হয় না। কেন সে তা পারে না? তাছাড়া এ তো ক্ষতি, নিজেকে অধিকতর বঞ্চিত করা।

চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অনন্ত বলিল, সময়—সময় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি লজ্জা পাই কমল।

সে তো আমারই লজ্জা।

তা বটে! কতদিন আমরা পরস্পরের কাছে লজ্জিত হয়ে আছি?

কমলা বলিল, মনে নেই।

মনে না থাকা আশ্চর্য কিন্তু অসঙ্গত নয়। অনন্ত আর কিছু বলিল না।

লঘুপদে ঘরে ঢুকিল মাধুরী। কোলে তার বছর-দেড়েকের একটি রুগ্ন শিশু। শিশুটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছিল।

কমলার দিকে খোকাকে বাড়াইয়া দিয়া মাধুরী বলিল, গিয়ে থেকে কাঁদছে। বাপমার কাছে এক ঘণ্টা ছেলে থাকতে চায় না, একি লজ্জা বলুন তো?

বলিয়া সে সকৌতুকে হাসিল। সে হাসিতে লজ্জার চিহ্নও ছিল না। কমলাই চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, খোকাকে কোলে নিয়া অপরাধীর মতো বলিল, সুশীলবাবু কি বললেন?

মাধুরী হাসিল, কি আর বলবে? শখ মিটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কথা তো শুনবে না! সকাল থেকে বলছি, কি হবে খোকাকে এনে? থাকবে তোমার কাছে খোকা? তা কেবলই বলতে লাগল, নিয়েই এসো না একবার খোকাকে দু-দিন যে ওকে আমি দেখিনি। অসুখ হলে ওর ন্যাকামি যেন বেড়ে যায়।

কমলা নীরবে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন মাধুরীর ছিল না, কিন্তু কমলার পিঠে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়াই রইল। পরের কোলে গিয়াই ছেলে যে চুপ করিয়াছে এতে তার যেন কৌতুকের সীমা নাই। ছেলে পর হইয়া যাওয়ার আনন্দ যথাসাধ্য উপভোগ না করিয়া সে যেন এখান হইতে নড়িবে না।

অনন্ত স্তিমিত নেত্রে মাধুরীর দিকে চাহিয়া ছিল, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের পর তার যেন বড় ঘুম পাইয়াছে। হঠাৎ সে সোজা হইয়া বসিল। এমন জমজমাট সৌন্দর্য সে জীবনে কখনো দেখে, নাই, পাথরে খোদাই করা এমন অর্থহীন তীব্র হাসিও নয়। মাধুরীর চোখের পাতাটি যেন কাঁপে না, এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অবসাদ আসে না, অনেকদিনের ইট-চাপা ঘাসের মত এক মুহূর্তে সমস্ত মুখ অসুস্থ সাদা হইয়া ওঠে,—প্রতিফলিত সূর্যালোকের মতো তার সেই বর্ণহীন শুভ্র রূপ দুই চক্ষুকে পীড়ন করে।

কমলা অস্ফুটস্বরে খোকার উদ্যত কান্না সংযত করে, বারেকের জন্যও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না।

কমলার দিকে চাহিয়া অনন্তের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতে লাগিল। পরের ছেলে কোলে নিয়া ও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না কেন? কি ভাবে ও? সে যে সুশীলকে কেন বরখাস্ত করিতে চায়, মনে মনে তারই একটা ভুল বিশ্লেষণ করিয়া চলিতেছে কি?

অনন্তের মনে হইল মাধুরী উপস্থিত না থাকিলে আজ সে কমলাকে না বলিয়া থাকিতে পারিত না, কোন নিগ্রহের একটানা আতঙ্কে তার দিনগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, পরের দিনের কি দুর্ভাবনায় অর্ধেক রাত্রি তার বিনিদ্র কাটিয়া যায়।

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাকে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরবেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিচে নামিয়া পিছনের মৃদু আহ্বানে অনন্ত চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধুরী বলিল, আমি আজ নিজে সন্দেশ করেছি। খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে?

অনন্ত বিবর্ণমুখে বলিল, রোজ রোজ কষ্ট করে কেন তুমি এসব করতে যাও মাধুরী?

আমার কোনো কষ্ট নেই। তবে আপনি যদি বিরক্ত হন—

তার চোখের সামনে কমলার দিকে চাহিয়া উদ্ধত হাসি হাসিবার পর এই সকরুণ বিনয় প্রকাশে অনন্তের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, সুশীলের অসুখ শুনলাম—

সামান্য অসুখ। আমি কাছে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সারাদিন আজ কবিতা লিখেছেন—

সামান্য কয়েকটি কথায় কৈফিয়ত ও অনুনয়ের কি অপূর্ব সমন্বয়! অনন্ত যেন হতাশ হইয়া গেল,—কবিতা?

হ্যাঁ। লিখবার সময় ওকে দেখলে আমার এমন ভয় করে! চোখ রক্তবর্ণ, কপালে একটা শিরা দপ্‌দপ্‌ করছে—

জ্বরের জন্য বোধ হয়।

মাধুরী ম্লানভাবে হাসিল, হবে। কিন্তু আমার ভয় করে। —কোথায় বসবেন?

লাইব্রেরিতে।

অনন্ত চিন্তিতমুখে লাইব্রেরিতে গিয়া বসিল। একটা প্লেটে একটিমাত্র সন্দেশ আনিয়া কাগজপত্র সরাইয়া টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া মাধুরী বলিল, করেছি বোধহয় পঞ্চাশটা, খাবেন মোটে একটা।

বেশি খেলে তুমি খুশি হবে?

মাধুরী ম্লানমুখে বলিল, হতাম, বেশি খেলে যদি আপনার শরীর খারাপ হওয়ার ভয় না থাকত।

একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া সন্দেশটা খাইয়া অনন্ত বলিল, জীবনটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে মাধুরী।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ওঠার পরেই জীবন সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক মন্তব্যে মাধুরী একটু বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল জীবন দুর্বোধ্য বৈকি।

একচুমুক জল পান করিয়া অনন্ত বলিল, শুধু অসামঞ্জস্য, কেবল খাপছাড়া বিধান। উচিত-অনুচিতে এতটুকু মিল নেই।

প্রমাণ দ্যাখো, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, তোমার তৈরি সন্দেশ একটার বেশি খেতে পারি না, মনে শক্তি নেই, সামান্য উত্তেজনার সূত্রপাতে আতঙ্ক হয়। তবু তো জীবন আমার নিঃস্ব নয়।

নয়? মাধুরীর কণ্ঠস্বর যেন অনুযোগ করিল, আপনি তো উদাসীন, সন্ন্যাসী!

অনন্ত করুণভাবে হাসিয়া বলিল, উদাসীন নই, ভীরু; সন্ন্যাসী নই, দুর্বল। ছেলেবেলা চোর-চোর খেলায় আমার ছিল বুড়ি ছুঁয়ে বিশ্রামের খেলা। আজও আমি তেমনি অশক্ত হয়ে আছি মাধুরী। নিজে চুরি হয়ে গেলেও ঠেকাবার ক্ষমতা আমার নেই। যে-খেলা শক্তিমানের, আমার কি উচিত সে-খেলায় যোগ দেওয়া?

মাধুরীর সমস্ত মুখ আবার সাদা হইয়া গিয়াছিল, নতচোখে অস্ফুটস্বরে সে বলিল, জানিনে। কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে ছাড়া যে খেলতে পারে না সে তবে কি করবে?

সে সকলের খেলা দেখবে, একটা মোটা বই টানিয়া নিয়া অনন্ত বলিল, হালকা মানুষ ভেসে উঠবে আকাশে। সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকবে। মর্ত্যের সুখদুঃখের সঙ্গে ওছাড়া তার আর সম্পর্ক কি?

আকাশছোঁয়া কথা! অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত মোটা বইটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে মাধুরী বলিল, আপনার ওষুধ আনব? কিছু খেয়ে সেটা খেতে হয়?

অনন্ত মুখ তুলিয়া বলিল, আনো। কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। সুশীলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলাম বলে কমলার সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে।

আর ঝগড়া করবেন না।

বলিয়া মাধুরী ওষুধ আনিতে চলিয়া গেল।

ওষুধ খাইবার সময় অনন্তের মনে হইল একবার উপরে গিয়া

গোপনে আরশিতে দেখিয়া আসিবে তার চোখ দুটিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কি না, কপালের একটা শিরা দপ্‌দপ্‌ করিতেছে কি না।· সেও কি আজ অসুস্থতার কবি নয়?

প্রথম দিন কমলা খালি পায়ে কাঁকর-বিছানো পথে হাঁটিতে পারে নাই। এখন কোনোই অসুবিধা হয় না।

পথের দু-দিকে ফুলের চারাগুলি যেন ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতা শুরু করিয়াছে। পট্‌পট্‌ করিয়া কয়েকটা রক্ত-গোলাপ ছিঁড়িয়া কমলা খোকার হাতে দিল। ফুলগুলির দিকে হাত বাড়াইয়া খোকা অস্ফুট আবেদন জানাইয়াছিল বলিয়া নয়, ফুল ছিঁড়িতে আজকাল আর তার দ্বিধা হয় না।

সুশীলের ঘর তিনখানার পিছনে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়ার ডগায় পড়ন্ত রোদ বিবর্ণ সোনার রঙ মাখাইয়াছে। আকাশে মেঘ নাই কিন্তু কার্তিকের কুয়াশার ইঙ্গিতে শূন্য ভরাট। রোদের রঙ তা আংশিক আত্মসাৎ করিয়াছে।

তিনটা সিঁড়ি ভাঙিলে একেবারে সুশীলের শয়নকক্ষে পৌঁছানো যায়। সুশীল শুষ্কমুখে বিছানায় বসিয়াছিল! একটু নিঃশব্দ হাসি দিয়া সে কমলাকে অভ্যর্থনা করিল।

খোকাকে নিয়ে এলাম।

তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওটাকে ফেলে এলেই ভালো করতেন। ওকে দেখলে জীবনে আমার যত ক্ষতি হয়ে গেছে সব একসঙ্গে মনে পড়ে।

কমলা চমকাইয়া উঠিল। জীবনে যার বোধহয় সবটাই ক্ষতি, জীবনের সমস্ত ক্ষতির কথা তার একসঙ্গে মনে পড়া কি ভয়ংকর!

সজল চোখে সে বলিল, আপনার কাছে মাপ চাইতেও আমার লজ্জা করে। জানেন, সব দেখেশুনে দিন-দিন আমার স্নেহমমতা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠছে। আপনার ছেলে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচতাম।

খোকাকে সে বিছানায় নামাইয়া দিল। ক্ষীণ শিশুটি যেন ক্রমেই তার অপরাধের মতো অসহ্য ভারী হইয়া উঠিতেছিল। কমলা টুলটাতে বসিলে সুশীল বলিল আপনাকে বলাই ভালো। খোকার জন্য আমার কোনো নালিশ নেই।

কমলা সংশয়ভরে বলিল, কেন ?

আপনার মধ্যে ও যে আমার আপন হয়ে রইল, এই আমার পরম লাভ। না, কোনো কিছুর জন্যেই আমার নালিশ নেই।

কমলা নীরব হইয়া রইল। নালিশ নাই! বালিশের তলা হইতে একটি ক্ষুদ্র ছিটের জামার যে অংশটুকু বাহির হইয়া আছে সে যেন সেটা চেনে না, তাকে আসিতে দেখিয়া সুশীল যে জামাটি বালিশের নিচে লুকাইয়াছিল এ যেন সে অনুমান করিতে পারে না! কি ভাবে তাকে সুশীল ?

কমলার মনে হইল, এ তার শাস্তি। স্ত্রী-পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে শূন্য ঘরে শূন্য মনে এর দিন কাটে, ঘরের বিশৃঙ্খলতায়, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, ওই মলিন শূন্য শয্যায়, বিষাদের প্রলেপ পড়িয়াছে। এ-ঘরে এভাবে বসিয়া থাকার বড়ো শাস্তি আর কি হইতে পারে মানুষের ?

অপরাধই বা তার কম কি ? কিছুই তো তার অজানা নাই। প্রতিকার প্রথম হইতেই সুশীলের আয়ত্তে ছিল! যেদিন খুশি ওই রঙচটা তোরঙ্গে জামাকাপড় ভরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বিদায় নিলে কে তার পথ আটকাইত ? এ বিপদ এমনই শ্রীহীন এমনই ভয়ানক যে পলায়নে লজ্জা ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত সর্বনাশকে সে নীরবে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করে নাই। তা যে অকারণে নয়তার চেয়ে কে তা ভালো করিয়া জানে ?

এলোচুলে মুখ প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, কমলা তাহা সরাইবার চেষ্টা করিল না। ঘোমটার মতো কালো চুল তার মুখের লজ্জা ঢাকিয়া রাখুক।

চালে আগুন লাগার সুযোগে গৃহস্থের ঘরের ভিত্তিতে যে সিঁদ কাটিয়াছে, এভাবেই তাহাকে লজ্জা গোপন করিতে হয়। কমলা তা জানে। অনেকদিন ধরিয়া অনেক রাত্রি জাগিয়া বাদামী রঙের তিনখানা ঘরে অনেক স্বপ্নের সংসার পাতিয়া এ বিষয়ে তার পুরাপুরি জ্ঞান জন্মিয়াছে।

ঘরের আলো আবছা হইয়া আসার সঙ্গে সুশীল কখন শুইয়া পড়িয়াছিল কমলা টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া দেখিয়া তার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে! এতক্ষণ চুপচাপ বাপের কাছে থাকিয়া তার দুই বাহুর আবেষ্টনীতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

খোকা বুঝি ঘুমোলো?

সুশীল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, হ্যাঁ। আমার গায়ের গরমে বোধহয় আরাম পেয়েছিল।

গায়ের গরম! জ্বর বাড়ল আপনার?

জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া কাছে গিয়া কমলা তার কপালে হাত রাখিল। জ্বর বাড়িয়াছে।

অসুস্থ শরীরে সারাদিন কেন কবিতা লিখলেন?

সুশীল মৃদুস্বরে বলিল, অসুখ শরীরে বিনা কাজে দিন যে কাটে না। আলোটা জ্বালুন তো, অন্ধকার হয়ে এল। তারপর খোকাকে নিয়ে যান। অসুস্থের সঙ্গ ওর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

কমলার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসুস্থের সঙ্গ কার পক্ষে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন শুনাইবে জানা না থাকায় কথা বলিতে সে সাহস পাইল না।

আলোটা খুঁজিয়া নিয়া দেশলাই জ্বালিতে সে অনাবশ্যক দেরি করিয়া ফেলিল। একটু বদল না করিয়া মুখের ভাবটা সে সুশীলকে দেখাইতে চায় না। *

---

* হাত মকৃশ করার সময় লেখা।

ধাক্কা

দুই বৎসর পূর্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুমতি কম্পিতপদে দুরুদুরু বুকে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে সংসারের সর্বত্র মূল্য বিস্তার করিয়াছে, প্রয়োজনের কল্যাণে এত মূল্য পাইয়াছে নিজের, পরগাছা যার স্বপ্নই শুধু দেখে।

আসিয়াছিল দুটি কাজের জন্য—ছেলে রাখা ও রুগ্না গৃহিণীর সেবা করা। আর এখন বাড়িতে প্রত্যেকটি মানুষ আহার আরাম বিশ্রামের সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারই যেন জন্ম-জন্মান্তরের দায়িত্ব।

অলকার হইয়াছে পক্ষাঘাত। অর্ধাঙ্গ অবশ।

দিবারাত্রি বিছানায় শুইয়া থাকে, কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আকাশপাতাল ভাবে, বিড়বিড় করিয়া নিজের অদৃষ্ট-দেবতাকে শাপে আর প্রতিরাত্রে শান্ত স্বামীর সঙ্গে কলহ করে।

বলে, 'তুমি? তুমি ছাইয়ের ডাক্তার, কচুর ডাক্তার। তুমি নির্লজ্জ। স্ত্রী যার এক বছরের বেশি বিছানায় পড়ে, কোন লজ্জায় সে পরের চিকিৎসা করতে যায় শুনি!'

উপসংহারটা করুণ!

'একটিবার খোকাকে কোলে নিতে পারি না এমনি অদেষ্ট!'—বলিয়া সছিদ্র হাপরের মতো নিশ্বাস নিতে নিশ্বাস ফেলিতে শাঁ-শাঁ শব্দ করিয়া অলকা কাঁদে।

এদিকের ঘরখানা সুমতির। তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। খোকাকে বুকে ফেলিয়া গালে গাল রাখিয়া ঘুম পাড়ানোর

কায়দাটা অবশ্য অলকার চোখে পড়ে নাই, ঘুমপাড়ানো ছড়াটাই শুধু কানে গিয়াছে। তাহাতেই এত।

আধ-ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়া সুমতি ওঘরে যায়।

'আপনার পাশে খোকাকে একটু শুইয়ে দেব দিদি ?'

অলকার শরীর বলিতে শুধু হাড় আর চামড়া। কোটর গত চোখে অনেকখানি জল জমিলে তবেই গড়াইয়া পড়িতে পারে। চোখ মুছিতে গিয়া তাহার সমস্ত মুখ চোখের জলে মাখা হইয়া যায়।

সে রাগিয়া বলে, 'আড়ি পেতে শোনা হলো বুঝি কথা ? না, হলো না ! কচি খুকি কিনা আমি, বুঝিনে কিছু। লজ্জা করে না ? বেহায়া !'

তাহার শীর্ণ দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। একটানা দুঃখ শ্রেয় জানিয়া সে যেন সংযম অভ্যাস করে, সুমতি প্রলোভনটা সামনে ধরিয়াছে বলিয়া তাই তার এত রাগ !

দক্ষিণের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় অক্ষয় মোটা ডাক্তারি বই পড়ে। বারেকের জন্যও সে মুখ তুলিয়া তাকায় না। ঘরে যে বেদনার একটা স্থূল অভিনয় হইয়া গেল সে-বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবার মতো অনুভূতিও তাহার যেন নাই।

তা অক্ষয় এমনি বটে,—নির্বিকার নিস্পৃহ। কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গৃহে শয্যাগতা স্ত্রীর আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন বোঝা, বাহিরে কেবল রুগ্ন ও আহত মানুষের সাহচর্য এবং মরণের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার ক্ষুব্ধ স্তিমিত বিষাদ,—সবই যেন তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ। সুপ্রাপ্য বলিয়াই বেদনা যেন মূল্য হারাইয়াছে।

দিনটা একপ্রকার বাহিরেই কাটে।

সকাল সাতটায় ডিসপেন্সারিতে যায়, সেখান হইতে কলে। বাড়ি ফিরিতে একটা বাজিয়া যায়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার আগে সে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে,—'ও খেয়েছে ?'

সুমতি বলে, 'হ্যাঁ।'

'তুমি?'

মুখের দিকে তাকায় না বলিয়া প্রশ্নটা নিছক ভদ্রতাসূচক মনে হয়।

'আপনি তো জানেন আমি শেষবেলায় হবিষ্য করি।'

'ও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষবেলায় হবিষ্য করার কি দরকার? রাত্রে কিছু খাও না বুঝি সুমতি?'

'খাই।'

'তবে?'

বলিয়া জবাবের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অক্ষয় উপরে উঠিয়া যায়।

জবাব যে সুমতি দিতে পারে না এমন নয়, ইচ্ছা করিয়াই দেয় না। রাত্রে সে অবশ্য কিছু জলযোগ করে কিন্তু রাত্রি এগারটার আগে নয়, তার আগে তাহার সময় হয় না। খাওয়ার সময় বিভাগ সম্বন্ধে অক্ষয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে তাহার লজ্জা করে, জবাব না দিবার ইহাই কারণ।

নাওয়া-খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য দু-ঘণ্টার বেশি সময় অক্ষয় পায় না। বাহিরে রোগী ডাকাডাকি করে, টেলিফোনের যন্ত্রটা বারবার শব্দিত হইয়া উঠে, তিনটা না বাজিতেই আবার সে বাহির হইয়া যায়। ফেরে রাত্রি আটটা-ন'টায়।

তখনও কিন্তু সে নিজেকে বিশ্রামের অবকাশ দেয় না। পড়ার ঘরে বসিয়া মোটা মোটা ডাক্তারি বই পড়িতে আরম্ভ করে। সুমতির মনে হয়, শোবার ঘরে ঢুকিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছার কাছে তাহার শান্তি হার মানিয়াছে।

এমন খারাপ কথা মনে হয় বলিয়া মনে মনে নিজের উপর সুমতি রাগ করে।

অলকা এদিকে নিত্যকার কলহ ও কান্নার জন্য থাকে ব্যাকুল হইয়া, বেচারির জীবনে এখন ওইটুকুই বৈচিত্র্য; অক্ষয় ফিরিয়াছে

টের পাইলেই এমন কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেয় যে, ও ঘরে উঠিয়া না গিয়া অক্ষয়ের আর উপায় থাকে না।

অলকা বলে, 'ও ঘরে এত কি মধু? এঘরে বসে পড়ো। ...দ্যাখো গো, গালে আমার একটা ব্রণ উঠেছে। বড় ব্যাথা।'

চটচটে ঘামে ভেজা অলকার গাল—কে যেন আঠা মাখাইয়া রাখিয়াছে। অক্ষয় আদর করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুই গালে একটি ব্রণও সে খুঁজিয়া পায় না, সস্নেহে বলে, 'ইস্, বড্ড ঘেমেছ যে!'

জীবন্ত পত্নীর শবের মতো শীতল ক্লেদাক্ত স্পর্শ আঙুল বাহিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের মনে ধাক্কা দেয় কি না কে জানে! বোধ হয় দেয় না। শব ঘাঁটা অক্ষয়ের বহুদিনের অভ্যাস।

ইহার পর খানিকক্ষণ অলকা চুপ করিয়া থাকে, তারপর প্রথমে ভালোভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং তাহা নালিশ ও কান্নায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু অক্ষয় এমনি নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িয়া যায় যে সে একটা কথাও শুনিতেছে না এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে।

অলকা সহসা ক্ষেপিয়া যায়।

'—বকে মরছি, শুনছ না যে? কেনই বা শুনবে, আমি মরলেই যে তোমার হাড়ে বাতাস লাগে।'

অক্ষয় মুখ তুলিয়া নিদ্রাতুর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বলে 'আহা, অলক, এমন করে রাগ কোরো না, কিছু না জেনে শুনে। তোমার কথা শুনছি বৈকি, শুনছি।'

'ছাই শুনছ! পড়া তোমার পালাবে না গো, আমি কিন্তু পালাব। আমি চিতায় উঠি তারপরেই না হয় ওসব ছাই পাঁশ পোড়ো? কদিন বাকি আর!'

অক্ষয় শান্তকণ্ঠে বলে, 'দেখ দিকি তুমি কিসব বলছ! এসব বই ছাইপাঁশ মোটেই নয় অলক, সব তোমার অসুখের বই। তোমায় সারিয়ে তুলতে হবে না?'

'হবে ?'

অলকা যেন স্তম্ভিত হইয়া যায়। উত্তেজনায় মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলে, 'হবে ? আমাকে সারিয়ে তুলতে হবে ? এ তুমি কি বলছ গো ! রাত জেগে আমার অসুখের বিষয়ে তুমি বই পড়ো ! আমায় মাপ করো গো, মাপ করো !

মাথাটা সে বেশিক্ষণ উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না, থপ্ করিয়া বালিশে পড়িয়া যায়। বিড়বিড় করিয়া কতবার সে যে 'মাপ করো, মাপ করো' বলে তাহার ঠিকানা নাই।

কিন্তু দেখা যায় তাহার কৃতজ্ঞতা অস্থায়ী। চোখের জল ভালো করিয়া শুকাইবার পূর্বেই স্বামীর ভালোবাসার এতবড় প্রমাণও তাহার নিকট মর্যাদা হারায়।

হতাশকণ্ঠে সে বলে, 'ছাই ! তুমি আবার আমায় সারিয়ে দেবে। আমি কি আর বুঝতে পারি না, কিসের জন্য তুমি বই পড়ো !'

'আমার মরাই ভালো',—এই বলিয়া শাঁ-শাঁ করিয়া কাঁদে।

ও ঘরে সুমতির মনে হয়, এতক্ষণে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আসিয়াছে। পৃথিবীর মতো খারাপ গ্রহ সৌর-জগতে যে আর নাই একথা টের পাইবার পর আর জাগিয়া থাকা চলে না। এবার ঘুমানো দরকার।

কিন্তু সুমতি ঘুমায় না। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া খোলা বারান্দায় দাঁড়ায়। দেখিতে পায় নিচে অন্ধকার উঠানে নন্দর ঘরের জানালা দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

সুমতির ইচ্ছা হয় ওই আলোয় কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ওই আলোর দিকে চাহিয়া না থাকিয়া ওই আলোয় দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেখে।

নন্দ—অক্ষয়ের কম্পাউন্ডার। অক্ষয়ের কম্পাউন্ডার আছে দু-জন। তিন বছর মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে নন্দর মানও বেশি, মাহিনাও বেশি।

সে অক্ষয়ের বাড়িতেই থাকে ও খায়। কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও ভোর পাঁচটায় উঠিয়া ডিসপেন্‌সারিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তখন আলো-অন্ধকারের মেশামেশি।

খাবার ও খাবার জল পেঁছাইয়া দিতে ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুমতির গা একটু ছম ছম করে। সকলের ঘুমের আড়ালে এই কর্তব্য পালনে কেমন যেন গোপন অভিসারের আমেজ আছে, অনুভূতির মধ্যে সেটুকু ধরা পড়া কোনোমতে নিবারণ করা যায় না।

নন্দর যত কাব্যও কি এই ভোরকে নিয়াই!

'কাল ঘুম আসতে একটা বেজে গিয়েছিল, সুমতি। তবু এত ভোরে উঠলাম। হয়তো আজ এখন দোকানে যাব না। তুমি চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব।'—বলিয়া নন্দ হাসে।

সুমতি রাগ করিয়া বলে, 'আজ থেকে রাত্রেই আপনার ঘরে খাবার রেখে যাব। ভোরে ওঠার কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।'

নন্দ তথাপি হাসে—'তাতে আমার ঘরের রাত-অতিথি ইঁদুর গুলিরই উপকার হবে, আর কিছু হবে না। আমি ক্ষুধার্ত হয়েই দোকানে যাব।'

'তাতে আমার ক্ষতিটা কি?'

কথাটা বলিয়াই নিজের বোকামিতে সুমতির মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়! সবটুকু রাগ নিজের উপরে গিয়াই পড়ে। ফাজলামি করিবার এমন সুযোগ অবহেলা করিবে, নন্দর কি সে উদারতা আছে? কথাটা বলা তাহার কোনোমতেই উচিত হয় নাই।

নন্দর সত্যই উদারতা নাই, সকৌতুকে হাসিয়া সে জবাব দেয়, 'সত্যি কোনো ক্ষতি নেই? তবু যদি শেষরাত্রে উঠলেও খাবার হাতে হাজির না হতে!'

'আমি রোজ এমনি সময় উঠি।'

'ওঠোই তো! কে তা অস্বীকার করছে? কেন ওঠো তাই নিয়ে প্রশ্ন।'

কথায় নন্দর সঙ্গে পারিবার যো নাই। সুমতি মুখ গোঁজ করিয়া বাহির হইয়া আসে। দুপুরে নন্দ খাইতে আসিলে সামনে বসিয়া খাওয়ায় না। রাত্রে একফাঁকে ঘরে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসে। ইঁদুরের কথাটা সে ভোলে না। ঢাকনির উপর একটা দশসেরি শিল চাপাইয়া দেয়। রান্নাঘর হইতে শিলটা নন্দর ঘরে বহিয়া নিয়া যাইতে তাহার যে রীতিমতো কষ্ট হয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাকরকে বলিলে সে অবশ্য কাজটা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু চাকরকে সুমতি বলে না। নন্দর সঙ্গে তাহার কলহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে চাকরকে টানিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

পরদিন সকালে খাবারের খবর নিতে গিয়া দেখে অমন ভারী শিলটা সরাইয়া ঢাকনি উলটাইয়া ঘরময় খাবার ছড়াইয়া রাতারাতি ইঁদুরে কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে! ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া সুমতি হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। কি ছেলেমানুষ নন্দ! কি করিয়া রাগের জবাব দিতে হয় আজও তা শেখে নাই। ঘরময় মিনতি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—আমায় প্রশ্রয় দিও করুণাময়ী!

অথচ এ যেন খাপ খায় না, এ যেন অর্থহীন। সুমতির চোখে সহসা জল আসিয়া পড়ে। ঘরের কোণে ওই রঙচটা তোরঙ্গ, দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো আধ-ময়লা একটা পাঞ্জাবি, তক্তপোশে পুরানো তোশকের বিছানা আর বালিশের পাশে ওই একতাড়া মণিঅর্ডারের রসিদ—ছড়ানো খাবারগুলির সঙ্গে এইসবের সামঞ্জস্য নাই যে একেবারেই। সুমতির মনে হয়, বজ্রের মতো কঠোর, ফুলের মতো কোমল এই লোকটি যে তাহার জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তার মধ্যে প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা লুকানো আছে, ইহাকে তাহার ভয় করিয়া চলা উচিত। এ একদিন তাহাকে বিপন্ন করিবে।

নন্দর প্রকৃতির গভীর দিকটার সঙ্গে সুমতির পরিচয় বেশি দিনের নয়।

এক সপ্তাহও হয় নাই, একদিন ভোরবেলা খাবারের বাটি ও জলের গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠক্ করিয়ানামাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফস করিয়া সুইচ্ টিপিয়া নন্দ আলো জ্বালিল।

সুমতি চমকাইয়া বলিল, 'ইস্! এ আবার কি?'

'একটা কথা আছে সুমতি। আলো না জ্বাললে তো তুমি দাঁড়াবে না। অথচ একটা ভয়ানক দরকারি কথা তোমাকে এখন না বললেই নয়।'

এ ভূমিকা সুমতি চিনিত। নন্দর বক্তব্য অনুমান করিতেতাহার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, পাঁচটা টাকা চাই, এই তো কথা?'

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, 'কি করে জানলে?'

যেন জানাটা সুমতির পক্ষে আশ্চর্য ব্যাপার। নন্দর যে দু'টার বেশি জামা নাই, ক্রমাগত তালি লাগাইয়া একজোড়া জুতাই সে যে আজ এক বৎসর ব্যবহার করিতেছে, মাসের দশ দিন না কাটিতে জলখাবারের ক'টা পয়সাও যে তাহার হাতে থাকে না, এসব যেন সুমতির অজানা!

'যেমন করেই জানি, টাকা চাই কি না বলুন।'

'চাই'

'দিচ্ছি এনে। কিন্তু মাইনের টাকাগুলো কি করলেন?'

নন্দর চোখদুটি সহসা স্তিমিত হইয়া গেল।—'জুয়া খেলেছি।'

'ষাট টাকা জুয়া খেললেন?'

'না, পঞ্চাশ। দশ টাকা একজন ধার নিয়েছে।'

সুমতি গম্ভীর হইয়া বলিল, 'শেষটা সত্যি হতে পারে, প্রথমটা খাঁটি মিথ্যা।'

'মিথ্যা নয়। রূপক।'

'রূপক না ছাই!' বলিয়া সুমতি বালিশের তলা হইতে মনি অর্ডারের রসিদের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিল। বলিল, 'কেদার মুখুজ্যেকে আপনি প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠান। মুখুজ্যেটি কে?'

নন্দ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ভগ্নীপতি।'

'আমিও ওইরকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এ তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! সীতা থাকে আপনার কাকার কাছে, মাসে মাসে মাইনের সব টাকাগুলি আপনি পাঠিয়ে দেন ভগ্নীপতিকে। পণের টাকা শোধ হচ্ছে নাকি? শোধ না হলে সীতা স্বামীর ঘর করতে পাবে না?'

'না। সীতাকে যে স্বামীর ঘর করতে হয় না, ও তার দাম সুমতি।'

ইহার পর নন্দ সব কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছিল। কেদার মুখুজ্যে ছিল নন্দর পিতৃবন্ধু—নেশার বন্ধু—মদের। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নন্দর বাবার মাথাটাও বোধহয় একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আর কোনো যোগাযোগ ঘটিয়াছিল কি না এখন আর জানিবার নাই, জানিয়া লাভও নাই। কেদারের সঙ্গে হটাৎ একদিন সীতার বিবাহ হইয়া গেল।

নন্দ কিছুই জানিত না। যে-রাত্রে সীতার বিবাহ হয় সে-রাত্রে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে সে মহানন্দে থিয়েটার দেখিতেছে।

'জানো সুমতি, ওদিকে সীতাহরণ হচ্ছে, আর আমি দেখছি থিয়েটার। থিয়েটার!—শিশির ভাদুড়ীর সীতা প্লে দেখছি।'

কাহিনী শুনিয়া সুমতি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া ছিল। শেষে আস্তে আস্তে একটা অতি ছেলেমানুষী প্রশ্ন করিয়াছিল, 'সীতাকে আপনি খুব ভালোবাসেন, না?'

নন্দ সহজভাবেই ইহার জবাব দিয়াছিল, 'বাসি। কিন্তু একটিমাত্র বোনের অমন অবস্থা হলে কোনো ভাই তা সইতে পারে

না। সিঁথির লাল ঘায়ের যন্ত্রণায় সীতার ছটফটানি তুমি যদি দেখতে সুমতি!'

সিঁথিতে লাল ঘা! কি বর্ণনা! সুমতি আর কথা কহিতে পারে নাই। অথচ তাহার অনেক বক্তব্যই ছিল। স্বামী বৃদ্ধ হোক মাতাল হোক, হিন্দু মেয়ের স্বামীর ঘর না করিয়া কেমন করিয়া চলে নন্দকে একথাটা সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল। বৃদ্ধ মাতাল স্বামীও যে স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালোবাসিতে পারে, অন্তত বিবাহের পর কয়েকটা বছর; মাতাল স্বামীর ছেলেমেয়ে নিয়াও যে একটা নারীজীবন একদিক দিয়া সার্থক হইতে পারে, এই ধরনের কয়েকটা কথা আভাসে ইঙ্গিতে নন্দকে জানাইয়া দিবে কি না মনে মনে সুমতি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছিল।

কিন্তু সীতার সিঁথির বর্ণনা শুনিয়া কিছু বলিতে তাহাকে ভরসা হয় নাই। নিজের সিঁথি তাহার বড় বেশি সাদা হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালেই সুমতি খাবার নিয়ে আসে।

নন্দ সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র রকমের খুশি হইয়া উঠে। হাসিয়া বলে 'আঃ, খাবারে আজ ক্ষমার অমৃত। দোকানে গিয়ে খানিকটা সায়ানাইড খেয়ে দেখব মরি কি না।'

'খাবেন না, মরবেন। এ ক্ষমা নয়। দয়া।'

নন্দর মুখ ঘনাইয়া আসে—'দয়া?'

'তবে কি ভাবেন আপনি?'

দু-জনের উদ্ধত দৃষ্টি নীরবে খানিকক্ষণ কলহ করে।

সহসা বাটিটা তুলিয়া নিয়া নন্দ মেঝের উপর আছড়াইয়া ফেলে। আঙুল বাড়াইয়া খোলা দরজাটা দেখাইয়া চাপা গলায় বলে, 'যাও। দয়াবতী, দয়া করে যাও।'

ক্ষমা চায় দুপুরে খাইতে আসিয়া। অন্যদিনের চেয়ে একটু সকাল করিয়াই আসে।

হাত জোড় করিয়াই হাসিয়া ফেলে। বলে, 'ক্ষমা সুমতি।'

ইহাতে নন্দকে ক্ষমা করিবার সুবিধাই হয়। কারণ সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া সে আর হাসিতে পারে না! তাহার চোখ দুটি ছলছল করিতে থাকে।

বলে, 'এবারকার মতো ক্ষমা করে ফেলো সুমতি, সত্যি বলছি আর কোনোদিন তোমাকে ঠাট্টা করব না।'

ঠাট্টা! সুমতি গম্ভীরমুখে বলে, 'আচ্ছা।'

'না।'

খুশি হইয়া শিস্ দিতে দিতে নন্দ চলিয়া যায়। কি অপরাধে সুমতির কাছে হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল, বাকি দিনটুকুর মধ্যেই সে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

রাত্রে সে যখন ফেরে অক্ষয় হয়তো খাইতে বসিয়াছে, অদূরে বসিয়া সুমতি তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছে; খাইতে বসিয়া অক্ষয় কথা বলে না, কখন কি প্রয়োজন খেয়াল রাখিয়া চাহিয়া নিতে পারে না, সুতরাং তাহার খাওয়ার উপর সুমতিকে তীক্ষ্ম নজর রাখিতে হয়। উঁকি দিয়া দেখিয়া নন্দ নিজের ঘরে চলিয়া যায়। আহারান্তে আঁচাইয়া অক্ষয় উপরে চলিয়া না গেলে সে খাইতে আসে না।

আসনে বসিয়া বলে, 'ওর সঙ্গে কেন খেতে বসি না জানো?'

নন্দর ছলোছলো চোখ দুটির কথা সুমতির মনে ছিল, সে সদয়ভাবে হাসিয়া বলে, 'জানি বৈকি। যতই হোক উনি মনিব তো।'

'ওঃ ভারী মনিব! আর তিনটা বছর পড়লে আমি ওর চেয়ে বড় ডাক্তার হতাম এ্যাদ্দিনে, তা জানো? বলতে পারলে না।'

সুমতি একটু ভাবিবার ভান করিয়া বলে, 'তবে ওঁকে দেখতে পারো না বলে বোধহয়।'

নন্দ ভাবিয়া বলে, 'তাও নয়। ভাগের পূজায় আমার রুচি হয় না বলে।'

ভাগের পূজা! পূজা! সুমতির যেন চমক ভাঙে। এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ তাহার রাগে লাল হইয়া উঠে।

এমনিভাবে দিন কাটে। মনের জোরে যে দূরত্ব সুমতি বজায় রাখিতে পারে না, বিষাদ ও বেদনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহার সৃষ্টি হয়। নিজের দুর্বলতার অপরাধটা ধীরে ধীরে নন্দর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাও সে বোধ করে। নন্দর পরিহাসে আর সে রাগ করে না, নীরবে উপেক্ষা করিয়া যায়, পরিহাসস্পৃহাও নন্দর সুতরাং আপনা হইতেই কমিয়া আসে।

'জেনেশুনে যত দোষ করেছি সব তুমি ক্ষমা করেছ সুমতি। না জেনে এমন কি দোষ করলাম—'

সুমতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করে না। ইহাকে আবার ভাব জামাইবার হীন প্রচেষ্টা মনে করিয়া তাহার গা জ্বলিয়া যায়, রুক্ষ সুরে সে বলে, 'আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি?'

নন্দর মন সরল, সে তথাপি হালকা সুরে বলে, 'আমার শত্রুর অসুবিধা হচ্ছে। তবে খাওয়ার সময় তুমি উপস্থিত থাকো না বলে অসুবিধাই বলো দুঃখই বলো, একটু হচ্ছে।'

'আমার সময় হয় না।'

শেষ পর্যন্ত নন্দ রাগিয়া উঠে, বিশ্রী কথা বলে :

'ভালোই, ভালোই। আমি শুধু কম্পাউন্ডার যে!'

ইহার একটা কড়া জবাব নন্দ প্রত্যাশা করে কিন্তু সুমতি নীরবে আপনার কাজ করিয়া যায়, সে রাগ করিয়াছে কি না তাহা পর্যন্ত নন্দ অনুমান করিতে পারে না।

ইহার পর সেও সাবধান হইয়া যায়, হাসিখুশি কম করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকে। সুমতিকে জানাইয়া দেয়—'তোমার জন্য নয়, সীতার অসুখ করেছে।'

সুমতি বুঝিয়াও না বোঝার ভান করিয়া বলে, 'কিসের? কি বলছেন?'

'আমি যে আজকাল গম্ভীর হয়ে থাকি তার কথা বলছি। তোমার জন্য নয়।'

সুমতি ভাবে, বাঁচিয়া গেলাম। ভাবে, ভগবানের অনেক দয়া তাই মনের গায়েও একটা কালির আঁচড় পড়া নিবারণ করা গেল।

আহ্নিকে বসিয়া সে যেন আবার ভুলিয়া যাওয়া স্বামীকে স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারে। জীবন যেন জীবনের সীমা ছাড়াইয়া আলো ও আনন্দ ভরা একটি অভিনব স্বর্গে উঠিয়া যায়।

নন্দ নিজের ঘরে বসিয়া রাত জাগিয়া মণি অর্ডারের রসিদ গোনে আর সীতাকে চিঠি লেখে। লেখে—

'আর ভাবনা নেই দিদি, শিগ্‌গিরই একটা বাড়ি ভাড়া করে তোকে আনাচ্ছি। ঘর সংসারের সব কাজ কিন্তু তোকে করতে হবে। তোর দাদা—গরিব মানুষ, ঝি-চাকর রাখতে পারবে না। বুঝলি? তবে তুই যদি খুব জোর বায়না নিস, উঠতে বসতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার 'বৌদি চাই' 'বৌদি চাই আবদার করিস, তাহলে দেখেশুনে খুব খাটতে পারে এমন একটা বৌদি তোকে এনে দিতে রাজি আছি।

আচ্ছা, তোর বৌদি যদি ধর বিধবাই হয়—'

অর্থাৎ নন্দ লিখিতে চায় যে সে যদি একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করে, তাহাকে বৌদি হিসাবে পাওয়া বিষয়ে সীতার মতামত কি, বাক্য যোজনার দোষে জিজ্ঞাসাটা নিজের মৃত্যু বিষয়ক হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে আর লেখে না; হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অলকা মরিয়া গেল। রাত্রি তখন ন'টা।

মরণকে যে-কোনো সংসারে এমন বিনা আড়ম্বরে স্বীকার করিয়া লওয়া-যাইতে পারে, সুমতির সে অভিজ্ঞতা ছিল না। শোকের কলরব নাই, বেদনার বাহুল্য নাই, ঘরের আবহাওয়া শুধু অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় এ-বাড়ির কর্ত্রী যেন

আজ মহাপ্রস্থান করে নাই, সুদীর্ঘকালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ঘুম ভাঙিবার পরেই সকলের এই নীরবতা, অন্য কোনো কারণে নয়।

বার কয়েক উঃ আঃ করিয়া দাসদাসী শোকপ্রকাশের অন্ত করিয়াছে। অক্ষয় গম্ভীর মুখে তাহার আরামকেদারার দুই বাহুতে কনুই ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকবার অশ্রু মার্জনা করিতে সুমতির নিজের চোখের জলও গিয়াছে ফুরাইয়া। নন্দ কোথায় যেন গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

খাটের উপর চাদর ঢাকা অলকার মৃতদেহ।

নিচে ঝি-র কাছে খোকা কাঁদিতেছিল, সুমতির মনে হইতেছিল, খোকার কান্নার শব্দটুকু শুধু ভিতরে নিয়া সে কানে ছিপি আঁটিয়া দিয়াছে, ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কেহ যদি মড়াকান্নাও কাঁদিয়া ওঠে সে শুনিতে পাইবে না।

কিন্তু মড়াকান্না কাঁদিবে কে? সে? সে আর সবই পারে, নিজের কান্নায় শব্দ যোজনা করিতে পারে না। নন্দর কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। মুখখানা তাহার আজ একটু অতিরিক্ত শুকনো মনে হইতেছে বটে, কিন্তু সুমতি শপথ করিয়া বলিতে পারে তাহার কারণ অলকার উপস্থিত মরণ নয়, অনুপস্থিত আঘাত অথবা দুশ্চিন্তা।

ঘরে ঢুকিবার পর ঠিক কতক্ষণ সময় নন্দ সীতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল জানিবার জন্য সহসা সুমতির মন কেমন করিয়া উঠিল।

মানুষের মরণ-বাঁচন যাহার ব্যবসা, ঔষধ ও আশ্বাস নিয়া যাহার দোকানদারি, কান্না তাহার একেবারেই সাজে না। তবু অক্ষয়ের আরামকেদারার সন্নিকটে একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত মোটামোটা বইগুলির দিকে চাহিয়া সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বইগুলির নৈকট্য সম্বন্ধে অক্ষয় যে কি করিয়া এমন

উদাসীন হইয়া আছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সুমতির বারবার মনে পড়িতে লাগিল। অক্ষয় যে বইগুলি দেখিতে পায় নাই সুমতি কোনোমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

অক্ষয় সুমতির দৃষ্টিকে অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিল, 'খোকা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে, সুমতি। ওকে নিয়ে এসো।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। খোকাকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক হইয়া দেখিল তেপায়ার উপর হইতে বইগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া সুমতি চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখান থেকে বই সরালে কে?'

নন্দ বলিল, 'আমি। ডাক্তারবাবু ও-ঘরে রেখে আসতে বললেন।' সুমতির মুখ পাংশু হইয়া গেল।

'ভয় করছে নাকি সুমতি?'

'ভয়? কিসের ভয়?'—বলিয়া সুমতি সরিয়া গেল। ভয়! অলকার মরণে তাহার ভয়! মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন তাহার প্রথম পরিচয়। সর্বাঙ্গে সে যে একজনের মরণের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে নন্দ কি তাহা দেখিতে পায় না?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, না বুঝিয়া সে-ই অনেকক্ষণ মা-র মরণের মান রাখিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইমা পড়িল। অক্ষয় বলিল, 'খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে সুমতি, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

খোকার উপর আজ যেন তাহার দরদের সীমা নাই।

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া সুমতি দেখিল এবার স্বয়ং নন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

'নন্দ লোক ডাকতে গিয়েছে সুমতি।'

সুমতি প্রশ্ন করে নাই, আপনা হইতে বলিল বলিয়া অক্ষয়ের কথাটা একটু যেন কৈফিয়তের মতোই শোনাইল।

সুমতি বলিল, 'ও।'

'ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলতে চাই সুমতি।'

অলকার শবকে শোনাইয়া তাহাকে অক্ষয়ের কি বলিবার থাকিতে পারে, সুমতি ভাবিয়া পাইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল, 'কি কথা ?'

অক্ষয়ের স্বর অচঞ্চল, মুখের ভাব নির্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সে যেন সাক্ষ্য দিতেছে।

'ও যে বাঁচবে না, প্রথম থেকেই আমি তা জানতাম সুমতি।'

'জানতেন! না না, জানতেন না।'

'কিন্তু ওকে বাঁচাবার চেষ্টা যে আমি প্রাণপণেই করেছি, তুমি তার সাক্ষী।'

অক্ষয় এতক্ষণ সোজা হইয়াবসিয়া ছিল, এইবার আরামকেদারায় ঠেস দিল।

যত নিঃশব্দেই ঢুকিয়া গিয়া থাক অলকার মরণ যে তুচ্ছ হইয়া নাই, বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না।

সেদিন রাত্রে মুমূর্ষুর ঘরের আবহাওয়ায় যে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দেখা গিয়াছিল সমস্ত বাড়িতে তাহা যেন ব্যাপ্তি নিয়াছে।

অক্ষয় বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রোগী অন্য ডাক্তার সংগ্রহ করে, অক্ষয় নিজের ঘরে খোকাকে নিয়া দিন কাটায়। ইজিচেয়ারটা সে এ-ঘরে আনাইয়া নিয়াছে।

বলে, 'আলস্য নয় সুমতি, এ আমার বিশ্রাম। আর কিছু-দিন ওভাবে চললে মারা পড়তাম।'

সুমতি কিছুই বলে না। নীরবে খোকাকে দুধ খাওয়ায়।

এ-ঘরে অলকার স্মৃতির আমেজটুকুও নাই। কবে যে সে এ-ঘরে আসিত, আলমারি খুলিয়া গুছানো জামাকাপড়গুলি

মেঝেতে নামাইয়া আবার গুছাইয়া তুলিত, বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধা শেষ হইলে হাই তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, অক্ষয়ের বিশ্বাস সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

সুমতি কেন যে ঘরের সর্বত্র অলকার অবলুপ্ত স্মৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে, অক্ষয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বাহিরে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরের বাতাস ভিজিয়া ভারী, আলো ম্লান। খোকাকে নিতে গিয়া কেমন করিয়া সুমতির হাতসুদ্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়াছিল, অক্ষয় জানে না। ইচ্ছা করিয়া যে নয়, সুমতি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই অক্ষয়ের অনুমান। তথাপি কয়েক মিনিট পরেই আলমারির উপরের তাকে লুকানো একতাড়া চিঠি সে খুঁজিয়া পাইল।

অলকাকে লেখা অক্ষয়ের প্রেমপত্র। একখানা নয় দু-খানা নয় পঁচিশ-ত্রিশখানা। সে যেন রঙিন সুতায় বাঁধা একরাশি পুরাতন, ব্যবহৃত, বিবর্ণ প্রেম!

আজ নিশ্চয় নয়! কবে যেন সুমতি চিঠিগুলি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। নহিলে সোজা আলমারি খুলিয়া ভাঁজ করে শীতের পোষাকগুলির পিছনটা এখন সে হাতড়াইবে কেন?

চিঠির তাড়াটা নিয়া গম্ভীর হইয়া অক্ষয় বলিল, 'মরা মানুষের জন্য শোক করা কর্তব্য, এ-কথা তুমিও জানো আমিও জানি।'

সুমতি কিছুই বলিল না।

'কিন্তু তার অত্যাচারটাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত কি না সে-বিষয়ে আমার রীতিমতো সন্দেহ আছে সুমতি।'

এবারেও সুমতি নীরব হইল।

'ওটা ভূতের উপদ্রবেরই সামিল। আত্মীয় পর কোনো ভূতের উপদ্রব গ্রাহ্য করা উচিত কি? সে কত বড় ভীরুতার লক্ষণ বলো তো!'

এ যেন বিশেষ করিয়া তাহাকেই তিরস্কার করা। বড় আয়নার মধ্যে নিজের বিধবা বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া সুমতির চোখে জল আসিল।

মাঝে মাঝে স্থগিত হইতে লাগিল বটে কিন্তু বৃষ্টি একেবারে কমিল না। দিনগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিতে উঠিতে আবার জলে ভিজিয়া যাইতেছে, এ-বাদল আশীর্বাদের মতোই। কিন্তু সুমতির ভালো লাগিতেছিল না। দ্বিপ্রহরে খোকাকে কোলে নিয়া নিজের ঘরে সে বসিয়াছিল, সকাল হইতে যে স্তিমিত বেদনা পীড়া দিতেছিল এখন তাহা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নন্দ আজ সারাদিন খায় নাই। দোকান হইতে সকাল—সকাল ফিরিয়া সেই যে সে শুইয়াছিল, আর ওঠে নাই। ডাকিতে গিয়া সুমতি শুনিয়াছিল তাহার শরীর ভালো নয়, সে খাইবে না। শরীরের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব মেলে নাই।

অথচ কোথায় যে তাহার অপরাধ সুমতি ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার বয়স তেইশ, সে যুবতী সে সুন্দরী তাহার স্বামী নাই, ইহা যদি সকলে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, এবার তাহার মরাই ভাল। কিন্তু কিছুই তো সে করে নাই! প্রাণ-পণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টার কবে তাহার ত্রুটি ঘটিয়াছে? তাহাকে নিয়া নন্দর অন-ধিকার চর্চায় শুধু ততটুকু রাগই সে করিয়াছে যতটুকু রাগ না হইলে মানায় না, সে রাগের জের টানিয়া চলিবার চেষ্টাও সে করে নাই। সকলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সহজ ও সাধারণ করিয়া রাখিতে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিয়াছে।

অথচ ইহাদের কল্যাণে জীবন তাহার আজ অকথ্য জটিলতায় ভরা। সব বিষয়ে সে-ই হইয়া উঠিতেছে অপরাধী।

সীতার দুর্ভাগ্য উপলক্ষ ষাট টাকার কম্পাউন্ডারি করাই যে নন্দ জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছে, সে অপরাধ তাহারই। এক সাহেবের প্রকাণ্ড ওষুধের দোকানে একশ দশ টাকার চাকরিটা

যে নন্দ পছন্দ করিল না, সেজন্য সুমতি ভিন্ন আর কেহ দোষী নয়। স্বাস্থ্য যে নন্দর ভাঙিয়া পড়িতেছে সে দায়িত্বও সুমতির।

অলকা যে বাঁচিল না, মরিয়াও স্বামীর দু-ফোঁটা চোখের জলের তর্পণ পাইল না, এ-জন্য স্বয়ং ভগবানও হয়তো একদিন সুমতিরই বিচার করিবেন।

এমনি সব কটু চিন্তায় সুমতি ব্যাপৃত ছিল, ও-ঘর হইতে অক্ষয় তাহাকে আহ্বান করিল। অনুযোগ করিয়া বলিল, 'একা একা দুপুরটা যে কাটে না সুমতি!'

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল, 'খোকাকে রেখে যাব?'

'খোকার সঙ্গে একতরফা আলাপ করব কতক্ষণ? তাছাড়া দুপুরবেলা আর রাত্রিটা তোমার কোল দখল করে থাকা ওর অভ্যাস, আমার কাছে কাঁদবে।'

সুমতি নতমুখে বলিল, 'কিন্তু দুপুরে একটু না শুয়ে যে আমি পারব না। কাল একাদশী করেছি।'

অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'ও, আচ্ছা, তবে তুমি যাও সুমতি, শোবে যাও। কাল তোমার একাদশী গেছে জানতাম না। তুমি বুঝি নির্জলা একাদশী করো?'

সুমতি নীরবে স্বীকার করিল। অক্ষয়ের আর কিছু বলিবার আছে কি না ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল নন্দও একদিন নির্জলা একাদশীর কথাটা তুলিয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়ের মতো এমন ভদ্র ও সংযতভাবে নয়। সে নির্জলা একাদশী করে শুনিবামাত্র একটুকরা কাগজ টানিয়া নিয়া মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছিল 'নির্জ্জলা', তারপর কাগজটা সামনে ধরিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, 'হঠাৎ দেখলে কথাটাকে 'নির্লজ্জ' মনে হয় না? হয় কি বলো? বলোই না ছাই হয় কি না হয়, তাতে আর তোমার এমনকিছু মহাপাপ হবে না।'

বিছানায় শুইয়া সুমতির মনে হইল অক্ষয়ের ভদ্রতার চেয়ে

নন্দর সেই অসংযত হাসিতে যেন কুটিলতা কম ছিল। নন্দর বিশ্রী মন্তব্যটার মধ্যেই যেন সহানুভূতি ছিল বেশি।

বিকালের দিকে বৃষ্টি কমিয়া গেল। অনেক ভাবিয়া সুমতি নন্দর খবর নিতে গেল। বলিল, 'উপোস করছেন কেন?'

নন্দ সবগুলি জানালা বন্ধ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটা ভোর-বেলার মতোই আবছা।

'আমার জ্বর হয়েছে।'

'বেশি জ্বর?'

'কপালে-হাত দিলেই টের পাবে জ্বর বেশি কি কম।'

কপালে হাত দিতে সুমতির সাহস হইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'একটু দুধ খান।'

নন্দ ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

'সমস্ত বাড়িতে পচা ঘিয়ের গন্ধ, লুচি ভাজছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে এসো খানকত লুচি, লুচিই খাব।'

'জ্বরের মধ্যে লুচি খাওয়া কি ঠিক হবে?'

নন্দ হাসিল।

'কপালে হাত দিয়ে যে জ্বর দেখতে পারে না, তার সে ভাবনা কেন?'

ইহার জবাব অবশ্য সুমতি দিতে পারিল না, কিন্তু লুচিও সে নন্দকে খাইতে দিল না। এক বাটি গরম দুধ আনিয়া কড়া সুরে বলিল, 'খান, ছেলেমানুষি করবেন না।'

কি মনে করিয়া নন্দ আর গোলমাল না করিয়া দুধ খাইল।

রাত্রে আবার দুধ খাইবার পালা। অন্ধকার গাঢ় বলিয়া এখন আর আলো জ্বালিতে কোনো বাধা নাই।

আলো জ্বালিয়াই সুমতির চমক লাগিল। নন্দর অভূতপূর্ব ভাবপরিবর্তন ঘটিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া সে একটা পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়াছে, দুই হাতের দশটা আঙুলে টেবিল ঠুকিয়া

অত্যন্ত জলদ একটা ধ্বনি তুলিয়া তাহারই তালে তালে মাথা নাড়িতেছে। রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া যায়, কপালের একটা শ্রীহীন কুঞ্চনের বারংবার লয় ও আবির্ভাব ঘটে, মুখখানি অস্বাভাবিক পান্ডুর ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

সুমতি ভীত হইয়া উঠিল। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?'

পা নামাইয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। চোখ খুলিতেই বোঝা গেল দু-চোখ তাহার জবা ফুলের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ কথা সে কহিল রসিকতা করিয়া।

'আমার প্রবল আনন্দ হয়েছে সুমতি!'

আনন্দই বটে! বিবর্ণ মুখে সুমতি বলিল, 'কেন? কেন আপনার এমন আনন্দ হলো?'

'পড়'—নন্দ একটি দুমড়ানো পত্র সুমতির হাতে গুঁজিয়া দিল। সুমতি পড়িল। নন্দর কাকার পত্র। সংবাদ সংক্ষিপ্ত। বিগত সতেরই শ্রাবণ সীতার বৈধব্য ঘটিয়াছে। নৌকা করিয়া কেদার গ্রামান্তরে যাইতেছিল। নৌকাতেই সে প্রাণ ভরিয়া মদ খায়। সুতরাং বর্ষার নদীতে টলিয়া গিয়া আর উঠিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া কেদার নদীর মধ্যে টলিয়া পড়িয়াছিল চিঠিতে সে-কথা লেখা নাই।

সুমতি বহুক্ষণ মুখ তুলিতে পারিল না। শুষ্ক চোখ দেখিয়া নন্দ কি ভাবিবে কে জানে! নন্দর মধ্যস্থতায় অচেনা সীতার জন্য সুমতি সত্য একটু একটু মমতা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে। কিন্তু অশ্রু আজ দুর্লভ। জীবনটা সম্প্রতি নানাবিধ নাটকীয় উপাদানে এমনি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে যে চোখে জল আনা আর সহজ নয়।

মনি অর্ডারের রসিদগুলি খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো সর্‌সর্‌ করিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সুমতির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নন্দ বলিল, 'জানো সুমতি, উত্তেজনায় আমার যে জ্বর এল সে শুধু মুক্তির আনন্দে নয়। নিজেকে খুনী বলে জানলে—'

'খুনী কি গো ?' সুমতি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল।

'না না, চমকাবার কিছু নেই সুমতি। সে খুনের কথা বলছি না। তিন বছর ধরে মনে মনে যে কেদারের মারণ-যজ্ঞ করেছিলাম সে তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাই কেবলই মনে হচ্ছে সে লোক যে অপঘাতে মরল তার দায়িত্বটা আমারই। ইব্‌-সেনের একটা নাটকে—আচ্ছা, থাক ইব্‌সেনের কথা।'

সুমতি চুপ করিয়া রহিল।

'শরীরটা এমন দুর্বল মনে হচ্ছে। যেন কতকাল রোগে ভুগেছি।'

সুমতি তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

নন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'বিশ্বাস করছ না ? কিন্তু সত্যি এরকম হয়। A sudden shock to the mind and its subsequent disturbances may result in severe physical sickness. কেন হয় তাও বলছি শোনো। আনন্দ ব্যথা ভয় এইসব উত্তেজনা মনে দেখা দিলেই শরীরের অনেকগুলি গ্ল্যাণ্ড থেকে রসস্রাব শুরু হয়। আনন্দ কম আর স্বাভাবিক হলে যে-রস বার হয় শরীরের তাতে উপকার হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রবল আনন্দের রস ঠিক বিষের মতো কাজ করে, ঠিক—'

'চুপ করুন।'

বলিতে বলিতে নন্দ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, থতমত খাইয়া চুপ করিল। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া বলিল, অক্ষয়-বাবুকেই জিজ্ঞাসা কোরো কথাগুলি সত্যি কি মিথ্যা। তিন তিন বছর ওমনি মেডিকেল কলেজে পড়িনি সুমতি, কিছু কিছু সবই জানি।'

'আচ্ছা ! দুধটা খেয়ে ফেলুন।'

নন্দ মুখ ভার করিয়া দুধ খাইয়া বলিল, 'এবার কি করতে

হবে ? লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমোব ? না ক খ শিখব ?'

'আপনার খুশি' বলিয়া সুমতি চলিয়া যাইতেছিল, নন্দ ডাকিয়া ফিরাইল।

'চলে যাও যে ? আমায় ঘুম পাড়িয়ে যাও। আমার আনন্দে বৈচিত্র্য দিয়ে যাও ভাল চাও তো, নইলে রাতারাতি হার্টফেল করব।'

সুমতি উদ্ধতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যে-জবাব সে দিতে চাহিয়াছিল, নন্দর মুখ দেখিয়া তাহা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শান্তকণ্ঠেই বলিল, 'কি করতে হবে বলুন।'

নন্দ আঙুল বাড়াইয়া বিছানাটা দেখাইয়া বলিল, 'বালিশ সরিয়ে বিছানায় বোসো, তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি শোব। ব্যস্, আর কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেও।'

সুমতি বিবেচনা করিয়া দেখিল, নন্দর দাবি যে অসঙ্গত নয়, তাহার সপক্ষে যুক্তি আছে। আনন্দে তাহার বৈচিত্র্য না আসিলে রাত্রে সত্যই সে ঘুমাইতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি এই উত্তেজনায় ছটফট করিয়া কাটাইলে আজিকার সামান্য অসুখ কাল বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া এতরাত্রে এই উত্তেজিত মানুষটির মাথা কোলে নিয়া ইহার বিছানায় সে বসে কি করিয়া ?

ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুমতি বলিল, 'না। বোন বিধবা হয়েছে এই অজুহাতে এতবড় অন্যায় করতে আপনার না বাধুক, আমার বাধবে।'

কথাটার সমস্তটুকুর অর্থ বুঝিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়া নন্দ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

'তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন যদি আমি কথা বলি—আচ্ছা তুমি যাও। আর এক মিনিট দাঁড়ালে তোমায় আমি সত্যি অপমান করে বসব সুমতি। এক্ষুণি তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। নন্দ অপমান করিবে বলিয়া নয়,

আর দাঁড়াইয়া থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। নন্দকে জানিতে তো তার বাকি ছিল না। নন্দ ছেলেমানুষি করিতে জানে ভালো করিয়াই, অপমান করিতে শেখে নাই আজও।

উপরে উঠিয়া বারান্দায় পা দিতেই অক্ষয় খপ করিয়া সুমতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

'তুমি নন্দর ঘরে ছিলে?'

দুর্বিনীত প্রশ্ন। সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'ছিলাম।'

'কেন ছিলে?'

'নন্দবাবুর ভগ্নীপতি মারা গেছে খবর এসেছে, খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই—'

অক্ষয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'কিছু মনে কোরো না সুমতি।'

সুমতি অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

অক্ষয় কৈফিয়ত দিল ঃ

'মনটা ভালো নেই সুমতি। খোকা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল আর তুমি ওদিকে গল্পে মেতে আছ ভেবে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল।'

সুমতি বলিল, 'খোকা কেঁদেছিল? কই শুনিনি তো।'

'কেঁদেছিল বৈকি। আমি কি তোমায় মিথ্যে বলছি সুমতি?'

অক্ষয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুমতি ভাবিতে লাগিল, সকালবেলা চিঠির তাড়া খুঁজিয়া পাওয়ার প্রতিক্রিয়াটা যে অক্ষয়ের দিক হইতে প্রতিশোধের রূপ নিয়া আসিবে এ তাহার জানিয়া রাখা উচিত ছিল। নন্দর মতো অক্ষয় ছেলেমানুষ নয়। অলকা তাহাকে প্রচুর নারী-অভিজ্ঞতা দিয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অক্ষয়কে তাহা কাজে লাগাইতেই হয়।

সে রাত্রির অপমানে রাগ করিয়া থাকার সুযোগ নন্দ পাইল না কারণ সুমতি তাহার উত্তেজনার জোরালো প্রতিষেধক দিয়া গেলেও

পরদিন তাহার ভালোমতোই জ্বর আসিল। মাথা কোলে তুলিয়া না নিলেও সুমতি সারাদিন তাহার মাথায় বরফ দিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর অক্ষয় নিজেই ওষুদ দিয়া গেল। সুমতির মুখের দিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'এর মধ্যে বিষ আছে, বুঝলে?

সুমতিও বোধহয় সেইপ্রকার কিছু অনুমান করিতেছিল, সভয়ে বলিল, 'বিষ?'

'হ্যাঁ। ভালো করে দাগ দেখে খাইও।'

সুমতি ছলছল চোখে বলিল, বিষ কেন?'

অক্ষয় হঠাৎ হাসিয়া বলিল, 'সে তো তোমায় আমি এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারব না! ওর যা অসুখ একমাত্র বিষেই তা সারে।'

'এক দাগের বেশি পড়লে মরে যাবে?'

না, বেশিরকম নেশা হবে। শিশির সমস্ত ওষুধ খেলোও মরবে না, দিনতিনেক নেশায় অজ্ঞান হয়ে থাকবে বড়জোর। ডাক্তার অনেক মানুষ মারে, কিন্তু ইচ্ছা করে একজনকেও মারে না সুমতি!

তা নিশ্চয় মারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার ডাক্তারের জন্মায়? সুমতির বয়স তো কম হয় নাই যে ইহাকে হেঁয়ালি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, কোনো জবাব দিবে না। একান্ত অবিচলিতভাবেই সুমতি বলিল, 'তা বৈকি। কর্তব্যের সঙ্গে সবসময় হৃদয়ের যোগ থাকবে তার তো কোনো মানে নেই।'

অক্ষয় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুমতির মুখখানি অনেকক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কিন্তু কোনোমতে একটা কর্তব্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটে গেলেই আর সব কর্তব্য ভুলিয়ে দেয়।'

ইহাও হেঁয়ালি নয়। সুমতি বলিল, 'তা দেয়, কিন্তু কোন্ কর্তব্যের সঙ্গে কার হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটেছে, অন্য কর্তব্যে অবহেলা দেখেই সবসময় সেটা ধরা যায় না। কর্তব্যের তো ছোট বড় আছে।

ওষুদের শিশি হাতে আকাশের সন্ধ্যার নিচে উঠানে দাঁড়াইয়া

এমন করিয়া আত্মসমর্থন করিতে সুমতির গলা বুজিয়া আসিতেছিল। অথচ এ-সমস্ত অক্ষয়কে জানানো প্রয়োজন। হৃদয়ের হিসাব-নিকাশ যে চিরকালের মতো সে চুকাইয়া ফেলিয়াছে, অক্ষয়কে ইহা বিশ্বাস করাইতে না পারিলে তাহার আর উপায় নাই।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা টাকার কাছে হার মানিতে পারে।—একটি মরণাপন্ন শাঁসালো রোগীর জীবনমরণের ভার নিতে অক্ষয় আপত্তি করে নাই।

রাত বারোটা অবধি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয় বাড়ি ফিরিতেছিল। দারোয়ান প্রভুর প্রতীক্ষায় ঢুলিতে ঢুলিতে রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, সে-ই অক্ষয়কে দরজা খুলিয়া দিল।

নন্দর ঘরের সামনে দিয়া অন্দরে যাইবার পথ। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দরজা খোলা। জেলখানার আধ-ঘুমন্ত শান্ত্রীর মতো বুকে চিবুক ঠেকাইয়া নন্দ লম্বালম্বি ঘরটা পরিক্রমণ করিতেছিল, গতি অত্যন্ত মন্থর, যে কোনো মুহূর্তে ঘুমাইয়া পড়িয়া মেঝের উপড় ঢলিয়া পড়া যেন আশ্চর্য নয়।

মেঝেতে লাঠি ঠুকিয়া অক্ষয় বলিল, 'তুমি যে যাওনি হে ?'

নন্দ দাঁড়াইল।

'না, যাইনি।'

'কেন ? যাওনি কেন ?'

'একটু দরকার ছিল তাই যাইনি। কাল যাব।'

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, 'কাল যাবে, কাল!—কাল আমার নতুন কম্পাউন্ডার আসবে সকালবেলা, সে কোথায় থাকবে শুনি ?'

'সে আসবার আগেই আমি যাব অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয় বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আমার মাইনে করা কম্পাণ্ডার আমায় অক্ষয়বাবু বলে, এ আমি পচ্ছন্দ করি না নন্দ। চিরকাল ডাক্তারবাবু বলে এসেছ, যাবার আগে আজ অকারণে একটা মনো-

মালিন্যের সৃষ্টি কোরো না। তা তুমি ঘরের মধ্যে এত রাত্রে পাক খাচ্ছ কেন?'

নন্দ ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'পরিশ্রম করছি। ঘুম আসে না ডাক্তারবাবু।'

'কোথাও যাবার সময় এরকম হয়' বলিয়া অক্ষয় অন্দরের দিকে পা বাড়াইল।

সিঁড়িটা অন্ধকার—নিবিড় জমাট অন্ধকার। অক্ষয়ের চোখ যেন অন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সুইচের অবস্থান জানা সত্ত্বেও আলো সে জ্বালিল না। বরং সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠিয়া অন্ধকারে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুয়ারের সামনে পুরা পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া আলোটা চোখে না সহাইয়া সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না। কাল যে আহার্য আগলাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে নাই তাহারই কৈফিয়তের মতো খোকাকে বুকের কাছে নিয়া মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া সুমতি জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

সিঁড়ি দিয়া নামা, উঠান পার হওয়া এবং নন্দর ঘরের দুয়ারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সংযত ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকা এই তিনটি কাজ করিতে সুমতির এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া সে যে একবারও পড়িয়া যায় নাই এইটুকুই আশ্চর্য।

ওপরে খোকার চিৎকার শোনা যাইতেছিল, ঘুমের চোখে সুমতি তাহার হাত মাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। কান পাতিয়া খোকার কান্না শুনিয়া সুমতি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। অমন করিয়া দিশেহারা হইবার কোনো কারণ ছিল না। খোকার হাত যদি ভাঙিয়া গিয়া থাকে? এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়া এমনভাবে খোকার কাছে বিদায় নিতে হইল তাহার!

নন্দ বলিল, 'কি সুমতি, শেষ বিদায় নিতে এলে বুঝি ?

জোর বাতাসে যেমন আকাশের মেঘ কাটিয়া যায়, নন্দর মুখের কালো ছায়াটা তেমনি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশে পাশাপাশি দুই টুকরো সাদা মেঘ যেমন সূর্যালোকে ঝকঝক করে নন্দর চোখ দুটি তাহার সঙ্গে তুলনীয়।

সুমতি ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরময় এত ছেঁড়া কাগজ উড়িতেছে যে মনিঅর্ডারের রসিদগুলি এখনো মেঝেতে ছড়ানো আছে কি না বোঝা যায় না। চৌকির উপর দড়ি দিয়া বাঁধা বিছানা, জিনিস-বোঝাই তোরঙ্গটা এদিকে হাঁ করিয়া আছে।

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল, 'না, বিদায় নিতে আসি নি। আপনার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। সকালে লজ্জা করবে, এখনি বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

রাতদুপুরে তাহার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে নন্দর চমক লাগার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্তে তাহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

'সে হয় না সুমতি!'

সুমতি বিহ্বলের মতো বলিল, 'হয় না ?'

নন্দ মাথা নাড়িল, 'না। এতবড় অনুচিত কাজে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। কি জানো, আমি ভয় পেয়ে গেছি! তাছাড়া, আমার সময় নেই।'

ভয় পাইয়াছে! সময় নাই! সুমতি আগাইয়া গিয়া নন্দর চৌকিতে বসিয়া পড়িল। সংবৎসর সাধনা করিয়া নন্দর আজ সিদ্ধিলাভের সময় নাই!

বহুকষ্টে সুমতি শান্ত হইয়া রইল। কি ঘটিয়াছে জানা দরকার। কিছু যে ঘটিয়াছে—ভয়ানক একটা কিছু যে না ঘটিয়াই পারে না, সুমতির তাহাতে সংশয় ছিল না। এভাবে হঠাৎ মানুষ বদলায়—নিজেকেই সে কি এখন চিনিতে পারিতেছে ? —কিন্তু আকারণে বদলায় না।

নন্দ আবার বলিল, 'রাগ কোরো না সুমতি, সত্য আমার সময় নেই। আমার এমন বিপদ হয়েছে বলবার নয়। সকালবেলাই আমার সীতাকে খুঁজতে যেতে হবে—কতদিনে খুঁজেপাব ভগবানই জানেন।'—বলিয়া সে একটু থামিল, 'কিন্তু আজকের জন্যে তুমি যেন লজ্জিত হয়ো না সুমতি। তোমার এই মাঝরাত্রির দুর্বলতা আমি ভুলে যাব। সত্যি, এ আমার মনেও থাকবে না। সীতাকে যদি খুঁজে পাই, সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যানের সঙ্গে তোমার কাহিনীও তাকে আমি শোনাব সুমতি।'

বলিতে বলিতে নন্দ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

'তাতে তুমি আপত্তি করবে? তোমার জীবনকাহিনী শুনবার অধিকার কি সীতার আর নেই? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না?'

নন্দ পায়চারি আরম্ভ করিল। সীতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তাহার সহিত কথা কহিতে সুমতি যেন অস্বীকার করিয়াছে, এমনিভাবে বলিতে লাগিল, 'তুমি কথা না কইলে অভিমানে সে কি করে বসবে কে জানে? ছেলেমানুষ তো, তোমার চেয়ে অনেক ছোট'—ভালো মন্দ বোঝে না। ছেলেটাকেও আমি চিনি সুমতি, কচি মেয়ে ভোলাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কতকাল ধরে সীতার মন ভাঙছিল কে জানে। অন্তত আজ রাত্রির কথা মনে করে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারবে না?'

বলিয়া নন্দ করুণ চোখে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওমিলনাইন

একুশ বছর বয়সের সময় সুনীতি নাম্ম একটি প্রায় একুশ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রমথের কয়েকমাসের জন্য খুব ভালোবাসা হয়। সেই তার প্রথম বাস্তব ভালোবাসা, সুতরাং, ব্যাপারটা তার পক্ষে একটু প্রচণ্ডই হইয়াছিল। বাকি জীবনটা সুনীতিকে ভালোবাসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে নিজেকে সে ধন্য জ্ঞান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুনীতি নিজের বেলা পাতলা একগাছি চুল আর প্রমথের বেলা জাহাজ-বাঁধা কাছি দিয়া পরস্পরের বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা করায় তৃতীয়এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটামাত্র বাঁধনটা গিয়াছিল ছিঁড়িয়া। প্রমথ বীভৎসরকম বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে সুনীতির জীবনে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব যেন তারই আবির্ভাবের পুনরভিনয় এবং বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থাটাও অবিকল একইরকম। তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি প্রমথ তাই হিংসার লেশটুকুও অনুভব করে নাই। তার বরং মনে হইয়াছিল যে কয়েকমাস পরে নিজের ভালোবাসার দড়িতে বেচারির যে ফাঁসি লাগিবে সেজন্য ওকে তার মায়া করাই উচিত।

এখন, এধরনের দু-চারটা ছেলেমেয়ে সংসারে থাকিবেই একঘেয়ে জীবনযাপনের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য, ছুটি-ছাটায় বেড়াইতে যাওয়ার মতো মাঝে মাঝে জীবনে যারা প্রেমের বৈচিত্র্য আনে। টানিয়াই আনে, মন অথবা গায়ের জোরে ঃ অর্থাৎ, কালচার অথবা রূপের আকর্ষণে। এই আকর্ষণে যখন সেই ধরনের ছেলেমেয়েরা সাড়া দেয়, বেহিসাবী আত্মসমর্পণ যাদের স্বভাব, তখন হয় একটু মুশকিল। মিলন তাদের প্রেমকে আরও জোরালো, আরো ঘনীভূত করিয়া দেয় এবং তারপর যথাসময়ে

যখন আসে বিচ্ছেদ, তখন সামলানো হয় কঠিন। ব্যর্থ প্রেম কিছু নয়, বিরহ শুধু মনের কষ্ট, ও সমস্তের জন্য মানুষের খুব বেশি আসিয়া যায় না,—ছেলে স্বর্গে গেলে মাকেও তো তা সহিতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক মনে হয় ট্র্যাজিডিটা, যখন বুঝিতে পারা যায় যাকে ভালো বাসিয়াছিলাম তার হৃদয় হৃদয়ের রীতিনীতি মানে না, আমাকে সরল সহজ ভালোমানুষ পাইয়া, আমার প্রথম যৌবনের অমূল্য সম্পদটুকু সে আমাকে ঠকাইয়া গ্রহণ করিয়াছে —শুধু একটু মজা করার জন্য। বিবাহের আগেই সুনীতির সঙ্গে তার যে অন্যায় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এই অপরাধটা প্রমথ নিজের বলিয়াই জানিত ঃ ও দোষটা কখনো মেয়েদের হয় না। তার লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া সুনীতি হাসিত।

বলিত, তুমি বড় ছেলেমানুষ।

প্রমথ ভাবিত, তার অনুতাপ দেখিয়া মমতার বশে সুনীতি তাকে সান্তনা দিতেছে। তারপর যখন সে জানিতে পারিল চিরদিনের জন্য তাকে জীবনের সাথী করিবার সাধ সুনীতির কোনোদিনই ছিল না, তখন সে হইয়া গেল একেবারে স্তম্ভিত। আত্মসম্বরণ করার জন্য সে একেবারে সাড়ে-চারশো মাইল তফাতে কিছুদিনের জন্য চলিয়া গেল বটে কিন্তু সেখানেও সময়ে অসময়ে সুনীতির মাথার চুলের ওমিলনাইন তেলের মৃদু গন্ধ অনুভব করিয়া মাথাধরা ওগা বমি-বমি আরম্ভ হওয়ায় সে আরও বেশি হত-ভম্ব হইয়া গেল। সাড়ে-চারশো মাইল বাতাসে গন্ধ ভাসিয়া আসিবে এমন ম্যাজিক তো ওমিলনাইন কেশতৈলের নাই! যে-বাড়িতে সে অতিথি হইয়া আছে সে-বাড়ির মেয়েরা ওমিলনাইন তেলের নামও জানে না, সুনীতি ভিন্ন ন'রকম দেশী ও বিলাতি কেশতৈল একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারার মতো টাকা অনেকের থাকিতে পারে কিন্তু শখ কারো আছে কিনা সন্দেহ। সুনীতির শাড়ি, ব্লাউজ, খোঁপা, চালচলন প্রভৃতি অনেক মেয়ে নকল করার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তার কেশতৈলের সুবাসটি চিরদিন হইয়া

থাকিয়াছে অননুকরণীয়। সুনীতির আরেকটা নাম ছিল ওমিলনাইন হেয়ার ওয়েল।

সুনীতির স্মৃতি যে একটা কেশতৈলের গন্ধ হইয়া রহিল প্রমথের কাছে, এ একধরনের মানসিক বিকার। নারীসংক্রান্ত না হোক, এরকম অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই আছে। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ দশ-পনের বছর কিংবা তারও বেশি পুরানো দিনের এক অবর্ণনীয় অনুভূতি দু-একবার কে না অনুভব করে জীবনে? পৃথিবীর রূপ, বাতাসের স্পর্শ ও গন্ধ, হৃদয়ের রসানুভূতি সমস্ত মিলিয়া জীবনের বহু পুরাতন ক্ষুদ্র এক অংশকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া দেয়। কচুবনে বৃষ্টি পড়িতে দেখিলে এখনো প্রমথ হইয়া যায় বারো বছরের বালক, বসিয়া থাকে নবাবদের আমলের পুরানো এক শহরে একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতে ভাঙা একটা ঘরে ইটের স্তূপের আড়ালে, শোঁকে ঝাঁটি, কুকুরশোঁকা প্রভৃতি বুনোচারার গন্ধ আর অনুভব করে মৃদু বিষাক্ত বাচ্চা একটা সাপের কামড়। সুনীতির স্মৃতি তেমনি পরিপূর্ণ হইয়া আছে ওমিলনাইন তেলের গন্ধে। এখন, সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার চার বছর পরে সুনীতির স্মৃতি আর সবদিক দিয়াই প্রায় প্রমথের কাছে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে, শুধু একটা গভীর অবসন্নতা ও মেয়েদের প্রতি একটা গভীরতর বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে করিতে ওমিলনাইন তেলের গন্ধ শুঁকিবার জন্য সুনীতিকে সে মনে করে।

এতকাল পরেও মেয়েদের প্রতি প্রমথের এই বিতৃষ্ণার ভাব বজায় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তার এই ভাবটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুনীতির কাছে তার দেহমন একদিন যে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিল, জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা রদ করিবার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন তার ভিতরে আপনা হইতে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই আভ্যন্তরিক

প্রতিবাদ তার এত জোরালো যে ভ্রান্তি টুটিয়া যাওয়ার মতো ঘনিষ্টতা আর কোনো রক্তমাংসের মেয়ের সঙ্গে তার জন্মানো সম্ভব নয়। সব মেয়েই যে সুনীতির মতো, এ-বিশ্বাস প্রমথের জন্মে নাই, সাধারণভাবে মেয়েদের সে অশ্রদ্ধা করে না। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া নারীবিদ্বেষের সমর্থক যুক্তিতর্কের আবিষ্কার করার চেষ্টাও সে করে না। মেয়েদের বিচার করিতে সে একেবারেই ভালোবাসে না, ও বিষয়ে মাথা ঘামানোকে সে মনে করে ছেলেমানুষি। তবু সেই আঘাতটির পরবর্তী বিকারে যে অন্ধ আতঙ্ক তার হৃদয়মনে বাঁচিয়া আছে, সেই বয়সে তরুণী নারীর ভালোবাসা লাভ করার স্বাভাবিক পিপাসার স্থানে সে আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিয়াছে ততোধিক স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। মেয়েরা ভালো, মেয়েরা দেবী। মেয়েরা ভালোবাসিলে মানুষ ধন্য হইয়া যায়। কিন্তু কাজ নাই বাবা কারো ভালবাসায় প্রমথের!

এইসময় পাইবে-না পাইবে-না করিয়া প্রমথ একটা হাকিমি চাকরি পাইয়া গেল এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিবাহ করিবে-না করিবে-না ঘোষণা করিতে করিতে প্রায় হইয়া উঠিল পাগল। কোনোদিন বিবাহ না করার ইচ্ছা প্রমথের ছিল না, আর দশটি সাধারণ সুস্থচেতা মানুষের মতো জীবনটা কাটাইয়া দিবার দিকেই বরং তার ছিল বেশি ঝোঁক। কিন্তু চিত্ত তো এখন তার সুস্থ নয়। এখন মন্ত্রপড়া সামাজিক বিবাহের পবিত্র বাঁধনে বাঁধিয়া একটি মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করিলে যদি মনের অসুস্থতা বাড়িয়া যায়, রূপান্তর নেয়! নিজের বৌকে আদর করিতে গেলেই যদি নাকে আসিয়া লাগে ওমিলনাইনের গন্ধ, মাথা ঘুরিয়া উঠে, গা করে বমি-বমি, আর মনে হয় যে এই রক্তমাংসের জীবটির মুখ-চোখ হাসি-গল্প মান-অভিমান চাল-চলন সব সুনীতির প্যারডি? তার চেয়ে আর কিছুদিন মনটাকে সুস্থ হইবার সময় দিয়া একটু ভারিক্কি বয়সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছু করাই নিরাপদ।

এগারমাস মফস্বলে একা একা হাকিমি করিয়া ভারিক্কি বয়সের

ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রমথ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিল কি না বলা যায় না, এক মাসের ছুটি লইয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে আসিয়া তিনদিন স্পষ্ট 'না' ও চারদিন আমতা-আমতা 'না' বলিয়া, গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে হইয়া গেল মৌন। সুতরাং যথাসময়ে তার একটি বৌ আসিল। ঠিক বৌ নয়' সহধর্মিণী অথবা জীবনসঙ্গিনী,—সংসারযাত্রা নির্বাহের উপায়স্বরূপিণী। কারণ, এই বয়েসে প্রথম বৌকে প্রধর্মাদিকে মানুষ সচারাচার যেভাবে চায়,—প্রিয়া বা প্রেমিকা হিসাবে, বিশেষ আত্মবিস্মৃত অবস্থাতেও প্রমথ কখনো বৌকে সেভাবে চাহিয়াছিল কি না সন্দেহ!

নাম হাসিরাশি। একটু বেঁটে কিন্তু দেখিতে বেশ, শুনিতে আরো। অর্থাৎ গলাটি তার ভারী মিষ্টি! মাথাধরার অসুখ থাকার জন্য যদিও হাসিরাশি খুব বেশি হাসিখুশি নয়, স্বভাবটি ভারী শান্ত, প্রকৃতিটি কোমল। এবং বোধহয় ওইজন্যই বয়সের তুলনায় সে একটু বেশিরকম ভারিক্কি। মেয়েটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় সংসারে বাঁচিয়া থাকাটাকে সে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করে, জীবনধারনের যেসব রীতিনীতি সে এতকাল জানিয়াছে ও মানিয়াছে অথবা এবার হইতে জানিবে ও মানিবে, সেগুলি চিরকাল পাইয়াছে তার গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্মান এবং চিরকাল তাই পাইবে।

প্রথমবার প্রমথ যখন তার সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল তখন হাসির ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া দেহে মনে দারুন অস্বস্তি বোধ করিয়া প্রথম শুরুতেই হঠাৎ আলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে কিছু মনে করে নাই। পরের বার তার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকায় ভাই যেভাবে বোনের সঙ্গে গল্প করে প্রমথ তার সঙ্গে তেমনিভাবে গল্প জুড়িয়া দিতে অবাক হওয়ার বদলে সে খুশিই হইয়াছিল। এইসব আবেগবিহীন সহজ মানুষকেই হাসিরাশি ভালোবাসে। ব্যস্ততার বদলে নিজের বৌ-এর সঙ্গেও যে এইরকম আস্তে আস্তে ভদ্রভাবে প্রথম চেনাপরিচয়টা ঘটিয়া উঠিতে দেয় সে কত ভালো

লোক! একবার সে যে পায়ে হাত দিয়াছিল সেটা সত্যসত্যই পিঁপড়া ঝাড়িয়া ফেলার জন্যই। এবং সেজন্য সলজ্জভাবে পায়ে হাত দিয়া তাকে প্রণাম করার সময়ও আচমকা হাত ধরিয়া সে যে তাকে খানিকটা আদর করিয়া বসে নাই এ-ও কি তার সহজ ভদ্রতার পরিচয়!

বিবাহের পর হইতেই অনেক বিষয়ে প্রমথ আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল, হাসিরাশিকে সঙ্গে করিয়া পূর্ববঙ্গের একটা শহরে প্রথম সংসার পাতিয়া বসিবার পর আরও বেশি আশ্চর্য হইয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল যে মানুষের জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই একপেশে ও অসম্পূর্ণ, অধিকাংশ ধারণা ও মতবাদ অসম্বন্ধ ও অযৌক্তিক। তা না হইলে হাসিরাশির সাহচর্য তাকে কেন এভাবে বদলাইয়া দিবে? কেন রসালো হইয়া উঠিবে আগেকার নীরস মুহূর্তগুলি, কেন তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে হইবে না এতদিন যে-সমস্তকে সে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করিত? যে-নিজেটাকে সে এত ভালোভাবে জানিত বলিয়া তার ধারণা ছিল এখন সেই নিজেরই এত সব অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত পরিচয় কোথা হইতে তার কাছে ধরা পড়িতে থাকিবে? কি বোকার মতোই এতগুলি বছর ওরকম বিশ্রীভাবে সে জীবন যাপন করিয়াছিল! সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবামাত্র সে যদি হাসিরাশির মতো একজনকে বিবাহ করিয়া এইরকম পবিত্র মধুর গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করিয়া দিত, যাতে, কোন্ বেলা কি রান্না হইবে সেটা পরামর্শ করিয়া ঠিক করার মধ্যে পর্যন্ত অনায়াসে যত খুশি প্রণয়ের আমদানি করা যায়, জীবনের এতগুলি বছর তবে তার ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

ওগো, শুনছ?—প্রমথ বলে।

হাসি বলে, না শুনছি না। একশ' বার এমন বুড়ো মানুষের মতো ডাকবে কেন শুনি?

কি বলে ডাকব তবে?

কেন, এই !—বলে ডকবে, শিস্ দিয়ে ডাকবে, নয়তো একটা আদরের নাম দিয়ে তাই বলে ডাকবে।

প্রমথ গম্ভীরমুখে বলে, তুমি যেচে সোহাগ নিচ্ছ, হৃদয়রানী ?

হাসি আরও বেশি গম্ভীর হইয়া বলে, নিজের জিনিস আমি যেভাবে খুশি নেব' তোমার তাতে কি ? তাছাড়া যারা ভালো মেয়ে হয় তারা বুঝি ছল করে সোহাগ নেয় ? পষ্ট দাবি করে।

সুনীতির সঙ্গে আরও ঢের বেশি সূক্ষ্ম হাসি-তামাশা চলিত, সুনীতি আরও ঢের বেশি আর্টিস্টিক ভঙ্গির সঙ্গে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কবিত্বের সৃষ্টি করিতে পারিত, তবু স্ত্রীর হাসির ভঙ্গি ও কথাই প্রমথের বেশি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। হঠাৎ সুনীতির প্রতি সে একটা স্পষ্ট জোরালো ঘৃণার ভাব অনুভব করে। এতকাল পরে তার আজ প্রথম আপসোসের সঙ্গে মনে হয় যে ক্লীবের মতো দার্শনিকের মতো সুনীতির অপরাধকে তার উপেক্ষা করা যেন উচিত হয় নাই, ওই ক্ষমাটা পর্যন্ত সুনীতি তাকে বোকা পাইয়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। সুনীতিকে একটা ভালোরকম শাস্তি দিলে বড় ভালো হইত,—মনুষ্যত্বের পরিচও দেওয়া হইত।

স্ত্রীর সঙ্গে এই তুচ্ছ কথোপকথনটি তার সকালবেলার। কাল হাসি সোডা দিয়া চুল সাফ করিয়াছিল, আজ তেল দিয়া স্নান করিবে। তার রুক্ষ ফাঁপানো চুলে একফোঁটা তেলের ছিহ্ণও নাই। তবু এই অসময়ে কোথা হইতে যে প্রমথ ঘ্রাণ পাইতে লাগিল কেশ-তৈলের ! সেই চিরপরিচিত ওমিলনাইনের গন্ধ !

হাসি হাসি বন্ধ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো ? কি হলো তোমার হঠাৎ ?

প্রমথ বলিল' তোমার তেলের শিশিটা নিয়ে এসো তো চট্ করে !

কেন ?

আগে আনো, বলছি।

হাসি তেলের শিশি আনিয়া দিল।

দেশী তেল। গন্ধ চড়া। ছিপি খুলিয়া শিশিটা নাকের সামনে ধরিয়া প্রমথ জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল, হাসি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল তার বিবর্ণ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্মের আবির্ভাব। আগেও সে দু-একবার স্বামীর এরকম আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু কোনোবারই এত স্পষ্ট ও প্রবলভাবে নয়। জিজ্ঞাসা করিতে প্রমথ ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে, ও কিছু না।

আজ প্রমথ শান্ত হইলে কারণ জানিবার জন্য হাসি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। প্রমথ বলিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল!

মাথা ঘুরে উঠল বলে তেলের গন্ধ শুঁকবে কেন?

তেলের গন্ধ শুঁকলে আমার মাথাঘোরা সেরে যায়।

কি বলছ পাগলের মতো? তাই কখনো হয়? কি হয়েছে তুমি বলছ না আমায়।

ওই তো বললাম!

আবোলতাবোল কতগুলি কৈফিয়তে তখনকার মতো হাসিকে শান্ত করা যায় বটে কিন্তু তার কৌতুহলের নিবৃত্তি হয় না। পরদিন সে আবার একথা তোলে। তারও পরের দিন। একবার প্রমথের মনে হয় সুনীতির কথা সব সে শোনাইয়া দেয়। কিন্তু এতকাল পরেও সুনীতির মাথার চুলের কাল্পনিক ঘ্রাণ নাকে লাগিয়া সে অতদূর অসুস্থ হইয়া পড়ে একথা জানিলে হাসি ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাকে সব কথা জানাইতে তার সাহস হয় না। কে জানে হাসি বিশ্বাস করিবে কি না যে আজকাল সুনীতির প্রতি আকস্মিক ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও জোরালো ভাবে সে ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আগের চেয়েও বেশি বিচলিত হইয়া পড়ে। হয়তো ধীরে ধীরে হাসির সঙ্গে তার যে গভীর অন্তরঙ্গতা জন্মিতেছে এসময় হাসিকে সুনীতির কাহিনী

জানাইয়া দিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে। সুখে শান্তিতে জীবন-যাপনের যে সম্ভাবনা তার দেখা দিয়াছে চিরদিনের জন্য তাহা হইয়া যাইবে অসম্ভব।

এতদিন পরে সুনীতির সম্বন্ধে নিজের মানসিক পরিবর্তন প্রমথকে আশ্চর্য ও চিন্তিত করিয়া রাখে। ব্যক্তিগতভাবে একজনের সম্বন্ধে এতকাল উদসীন থাকিবার পর, একটা বিষাদময় বৈরাগ্যে জীবনের সুখদুঃখকে মৃদুভাবে উপেক্ষা করিয়া দশজনের মাঝখানে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া আবার বাস্তবজীবনকে ভালোবাসিয়া নূতনভাবে জীবনটা আরম্ভ করিবার পর সেই একজনের প্রতি এমন ভয়ানক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আসিবার অর্থ কি? এসব মানসিক বিকারের কি আবির্ভাব ঘটা উচিত ছিল না তখন, সুনীতির ব্যবহার যখন তাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল? সুনীতিকে প্রায় ভুলিয়া যাওয়ার পর সে কি তার জন্য নূতন করিয়া বিরহের জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল? এ তো বড় খাপছাড়া কথা!

মাঝে মাঝে কি ভাবো এত?—হাসি জিজ্ঞাসা করে।

তোমার কথা ভাবি।

হাসি খুশি হইয়া বলে, সত্যি? কিন্তু আমি যখন কাছে থাকব না তখন আমার কথা ভেবো,—এখন থেকে কেন? মা তো কদ্দিন থেকে লিখছেন যাবার জন্য, এসেছিও তো অনেকদিন হলো, মাস-খানেকের জন্যে দাও না পাঠিয়ে আমাকে মা'র কাছে?

প্রমথ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, না না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমায় ছেড়ে আমি একদিনও থাকতে পারব না।

আগে প্রথমে নাকে লাগিত ওমিলনাইন তেলের গন্ধ, তারপর আসিত অন্য উপসর্গ। আজকাল প্রথমে প্রমথ সুনীতির কথা ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া তোলে, তারপর আসে ওমিলনাইনের

সুবাস ও পরবর্তী কষ্টগুলি। ব্যাপারটা প্রমথকে বেশিরকম দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে এইজন্য যে এই অস্বাভাবিক আক্রমণ ঘটিবার সময় ছাড়া বাকি প্রায় সব সময়েই সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে করিতে মহানন্দে বাঁচিয়া থাকে। আগে সে তার বিকারকে গ্রাহ্যই করিত না, এখন এরকম কেন হয় বুঝিবার চেষ্টা করে, এরকম হওয়া বন্ধ করার কোনো উপায় আছে কি না বসিয়া বসিয়া তাই ভাবে।

তবে, মোটামুটি তাকে সুখীই বলা যায়। পাঁচবছরের বেশি সময়ের ব্যবধান ও কে জানে কতখানি দূরত্ব পার হইয়া সুনীতির মাথার ওমিলনাইন তেলের গন্ধ তার নাক ও মনের সঙ্গে যে রসিকতা করিতে আসে, সেটা অল্প সময়ের জন্যই। কিছুক্ষণ একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে। তখন আর বুঝিবার উপায়ও থাকে না যে তার শান্ত হাসিখুশি মুখের পিছন দিকে, চুলে ঢাকা খুলির শক্ত হাড়ের তলে যে নরম মগজটা আছে, তার মগ্ন-চেতনার অংশটুকুতে বাস করে এমন খাপছাড়া একটা বিকার।

হাসিরাশিকে প্রমথের এতই ভালো লাগিয়াছে যে, কয়েকদিনের জন্যও তাকে ছাড়িয়া থাকিবার কথা ভাবিলে সত্যসত্যই তার কষ্ট হয়। এরকম সরলা, স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী ও সহজাত সু-ভাবাপন্না স্ত্রী পাওয়ার জন্য নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করে। বিবাহ করার আগে যা ছিল শুধু অসম্ভব কল্পনা, যে সুখ ও শান্তির স্বরূপ সে প্রায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, জীবনের নিরপেক্ষ সদয় দেবতার কল্যাণে আজ সে প্রায় সবই ফিরিয়া পাইয়াছে। শুধু ওমিলনাইনের অত্যাচার সহ্য করিবার দুর্ভাগ্যটা যদি তার না হইত! আদর্শ জীবন হইত তার, কোনো দিকে এতটুকু খুঁত থাকিত না!

এমনিভাবে দিন কাটিতে কাটিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ছুটিটা কাটাইবার জন্য প্রমথ সস্ত্রীক

আসেন কলিকাতায়। কলিকাতায় পৌঁছিবার দিনই সন্ধ্যার পর তার রহস্যময় মোহের রাজ্য হইতে ওমিলনাইনের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া তাকে ভয়ানক উতলা করিয়া দিল। পরদিন সকালে সে হাসিকে বলিল, তুমি মাথায় যে তেল মাখো ওটার গন্ধ ভারি বিশ্রী। আমি একটা আশ্চর্য তেল এনে দিলে মাখবে?

আশ্চর্য তেল আবার কি জিনিস গো, এ্যাঁ?

কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন তেল মিশিয়ে আমি নিজেই তৈরি করে দেব, মাখবে তো?

ওমা, কেন মাখব না? চুল উঠে গেলে কিন্তু মজা দেখাব তোমায়! সে দায়িত্ব তোমার।

প্রমথ বলিল, উঠে যাবে? চুলের ভারে হাঁটতেই পারবে না দেখো। কি নাম জানো তেলটার? ওমিলনাইন।

কিছুকাল হইতে এই কথাটা প্রমথ ভাবিতেছিল। অস্তিত্বহীন ওমিলনাইন যদি তাকে এরকমভাবে বিরক্ত করে, নিজের চারদিকে আসল ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গন্ধটা অভ্যস্ত করিয়া আনিলে হয়তো আর সে বিচলিত হইবে না? সবসময় যে-গন্ধ সে অনুভব করিবে সে-গন্ধের কাল্পনিক আবির্ভাব হয়তো সে টেরও পাইবে না। প্রথমটা হয়তো সর্বদা এই গন্ধ শুঁকিতে তার খুবই খারাপ লাগিবে, হয়তো অল্প সময়ের ব্যবধানে বারংবার তার মনের বিকার জাগিয়া উঠিবে, মাথাঘোরা গা বমি-বমি করার আর বিরাম থাকিবে না। তবু, আসল ওমিলনাইনকে অভ্যাস করিয়া শেষ পর্যন্ত নকল ওমিলনাইনকে যদি জয় করিতে পারা যায়, একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখা ভালো।

একবার সুনীতিকে প্রমথ ওমিলনাইনের উপকরণগুলি উপহার দিয়াছিল। শুধু এইজন্য ন'-টি বিভিন্ন তেলের নাম এতকাল পর্যন্ত কারো মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রমথের জীবনে ওমিলনাইন কেবল একটা মিশ্রিত কেশ তৈল নয়, সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুনীতির চেয়ে এই তেলটার কথাই বোধ হয় তাকে

ভাবিতে হইয়াছে বেশি, এখনো না ভাবিলে চলে না। ন'-টি তেলের প্রত্যেকটির নাম আজও তার নিজের নামের চেয়েও স্পষ্ট-ভাবে মনে আছে।

সেইবেলাই ওমিলনাইনের উপকরণ আসিল। ছোটবড় দেশী-বিলাতি ন'-টি বিভিন্ন কেশতৈলের শিশি। তাকে তেল মাখানোর জন্য স্বামীর আয়োজন ও আগ্রহ দুটারই পরিমাণ দেখিয়া হাসি-রাশি হাসিতে লাগিল।

এতগুলি তেল মাখব ?

দাঁড়াও না, এমন তেল তৈরি করে দেব, গন্ধে সবাই মূর্ছা যাবে। বিকেলে এই তেল দিলে চুল বেঁধো, কেমন ?

দুপুরে একটা কাঁচের পাত্রে তেলগুলি মেশানো হইল। তখন প্রমথ আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল তার এতদিনকার কাল্পনিক ওমিলনাইনের সঙ্গে এই আসল ওমিলনাইনের গন্ধের কিছু পার্থক্য আছে। যতক্ষণ এই পার্থক্যটুকু খেয়াল করিয়া সে বিস্মিত হইয়া রইল ততক্ষণ তার আর কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। মাথা ধরিল না প্রমথের, গা, বমি-বমি করিতে লাগিল না, একটা নূতন ধরনের অস্বস্তিকর রহস্যময় যন্ত্রণা বোধ করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ানক একটা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও কি ঘটে দেখিবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইলে মানুষের যেমন লাগে সেইরকম একটা ক্লেশদায়ক বিপন্নতার অনুভূতি। এক একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ থাকে, তামাশা করিয়া একটা ছোট ঘরে কয়েক মিনিটের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলেও যাদের দম আটকাইয়া আসে, ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ওমিলনাইনের গন্ধের আবেষ্টনী তেমনি পীড়ন করিতে লাগিল প্রমথকে। সে জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল।

প্রথমটা হাসিরাশি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, কি হলো তোমার ? তেলের গন্ধে নিজেই মূর্ছা যাচ্ছ নাকি সত্যি-

সত্যি ?—গন্ধটা সত্যি ভারি অদ্ভুত !

তারপর ভয় পাইয়া সে কাঁচের পাত্রটা প্রমথের সম্মুখ হইতে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই সেখানে বসিয়া পড়িল, প্রমথকে নাড়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, কি হলো ? কি হলো তোমার হঠাৎ ? এমন করছ কেন ?

প্রমথ কাতরভাবে বলিল, কিছু হয়নি।

হাসিরাশি ব্যাকুল হইয়া বলিল' হয়নি। তোমার মুখ দেখে বুকের মধ্যে কাঁপছে আমার। কি হয়েছে বলো না ?

প্রমথ একথার কোনো জবাব দিল না। উঠিয়া জামা গায়ে দিল।

হাসি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছ ?

ভবানীপুর যাব।

ভবানীপুর সে গেল বটে কিন্তু গেল পার হইয়া। হাজির হইল বালিগঞ্জে, সুনীতির গৃহে। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সে যেভাবে সোজা ওখানে গিয়া পেঁছিল তাতে একথা মনে করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল যে সুনীতিকে দেখিবার জন্যই সে বাড়ির বাহির হয় নাই।

সুনীতি আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি আশ্চর্য ! কি ভাগ্য আমার ! বোসো, বোসো। কবে এলে কলকাতায় ? তুমি এখন কুমিল্লায় পোস্টেড আছ, না ? তুমি অবিশ্যি আমায় ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি কত খবর রাখি দেখছ ! বিয়ে করেছ নাকি ?

প্রমথ বলিল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব সুনীতি। তুমি এখনো চুলে ওমিলনাইন তেল মাখো ? গন্ধ পাচ্ছি না তো ?

সুনীতিও আরও আশ্চর্য হইয়া বলিল, এ্যাদ্দিন পরে এসে, প্রথমেই এই কথা জিজ্ঞাসা করলে ? না, ওমিলনাইন ফোমিলনাইন মাখি না আর। ওসব আর ভালো লাগে না। মানুষ কি চিরদিন একরকম থাকে ?

হঠাৎ সুনীতি গম্ভীর ও বিষন্ন হইয়া গেল।—তুমিই বলো, চিরদিন কি মানুষ একরকম থাকে? তখন ওইরকম স্বভাব ছিল, খাপছাড়া কাজ করতেই ভালোবাসতাম। মাথার তেলটা পর্যন্ত নতুন কিছু না হলে চলত না। সে-স্বভাব অনেকদিন গেছে। এখন—

আচ্ছা, আজকে উঠলাম সুনীতি।

আসতে না আসতে উঠলে কিরকম? এরকম আসার মানে? বোসো না একটু, খানিক কথাবার্তা বলি?

প্রমথ সহজভাবেই বলিল, না বসার সময় নেই। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সঙ্গে করে সিনেমায় যেতে হবে।

সুনীতি বলিল, ও, এবার বুঝতে পারছি। একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছ এই খবরটা দিতে এসেছিলে। তিনি কিরকম রূপসী আর গুণবতী সে বর্ণনাও দাও, মন দিয়ে শুনছি। একটা কিছু করতে এসে কাজটা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে নেই।

প্রমথ বলিল, রূপ-গুণ তেমন কিছু নেই সুনীতি! তবে মনটা খুব সরল আর চরিত্রটা ভালো।

সুনীতির বাড়ি হইতে প্রমথ নিজেদের বাড়ি ফিরিল না, এদিক-ওদিক খানিক ঘুরিয়া একাই সিনেমা দেখিতে গেল। মানুষের সরলতা ও সুচরিত্রতা তার কাছে হঠাৎ মূল্যহীন, অর্থহীন, অকারণ মনে হইতেছিল। কি আসিয়া যাইত সে-সময় সুনীতিকে ক্ষমা করিলে, তার চাকরির খবর গেজেটেড হওয়ার পর সুনীতি যখন তাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল?

হাসিরাশি ওমিলনাইন তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, সারারাত তার মাথাটি থাকে প্রমথের মাথার পাশে। ভালো ঘুম হয় না প্রমথের। দিনের বেলা বাড়ির যেখানে যায় সেখানেই যেন প্রমথ ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আত্মীয়স্বজনেরা যেন ঘুরিয়া বেড়ায় ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া। ওমিলনাইনের সুবাসে বাড়ির সকলে মূর্ছা যায়

নাই কিন্তু মোহিত হইয়া গিয়াছে। সকলে আগ্রহের সঙ্গে ওই তেলটাই ব্যবহার করে। হাসিরাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই তেলটা বিলায়। স্নানের আগে প্রমথকেও মাখিতে দেয়।

প্রমথ হঠাৎ বলে, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি আমার সঙ্গে?

হাসিরাশি স্তম্ভিত হইয়া বলে, ইয়ার্কি? কি বলছ তুমি?

প্রমথ মুখ ফিরাইয়া বলে, আমি সর্ষের তেল ছাড়া কিছু মাখি না জানো না তুমি?

একদিন অন্য তেল মাখতে বললে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

হাসিরাশি অভিমান করিয়া থাকে। স্ত্রীর অভিমান ভাঙাইতে গিয়া এবার প্রমথের মন ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়া যায়। আর একজন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া ভাঙাইবে শুধু এইজন্য যে-অভিমান, এবার সে অভিমানকে তার অতি কদর্য বলিয়া মনে হয়। সরলতা না ছাই। একরঙা ছবির মতো এ শুধু বৈচিত্র্যের অভাব। হাসিরাশি আগে যে সাধারণ একটা তেল মাখিত, ওমিলনাইন তেলের তুলনায় সে তেল যেমন কুটিল ও জটিল, সুনীতির তুলনায় হাসিরাশিও তেমনি।

ছুটি শেষ হওয়ার দু-দিন আগে প্রমথ একদিন হঠাৎ হাসিরাশিকে বলিল, তোমাকে নেবার জন্যে ওরা খুব ব্যস্ত হয়েছে, না?

হাসিরাশি বলিল, হবে না? প্রায় আট মাস হলো এসেছি।

তোমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে তো?

ওমা, বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না কার?

সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া হাসিরাশির মাথার ওমিলনাইন তেলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রমথ বলিল, তাহলে চলো কাল আমরা বেরিয়ে পড়ি। তোমাকে বাপের বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে আমি একা কুমিল্লা চলে যাব। একা একা আমার খুব কষ্ট হবে বটে, তবু—

জন্মের ইতিহাস

খোকার আসার যখন মাস কয়েক বিলম্ব ছিল, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দু-জনের জল্পনা-কল্পনার আর বিরাম থাকিত না। তার অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক অবাস্তব এবং প্রায় সমস্তটাই স্বপ্নবৎ মনোরম। এ-হেন আশ্চর্য সম্ভাবনা যেন জগতের আর কোনো নরনারীর জীবনে আজ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। তিন বছর ধরিয়া তাহাদের যে অনন্যসাধারণ প্রেম বসন্তের ফুলবনে পথ-ভোলা পথিকের মতো লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন বাধাহীন অবস্থায় ঘুরিতেছিল আজ লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়ামাত্র সে-প্রেম তাহাদের স্বর্গে মর্তে অতীত ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সকল প্রেমের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠন নিভাইয়া সুলতা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়াছে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবার পরেও ঘরের কোণে এ-দ্বীপ জ্বলিতে থাকে। খানিক আবোল-তাবোল বকিবার পর বিকাশ বলে, 'বৌ অনেকের সুলতা থাকে, কিন্তু তোমার মতো বৌ—'

সুলতা মনে মনে বলে, 'কত জন্মের তপস্যা আমার সেটা তো দেখতে হবে?'

বিকাশের একটু উচ্ছ্বাস জাগে, আন্তরিক নাটকীয় সুরে সে বলে, 'না সুলতা, তুমি শুধু আমার প্রিয় নও, প্রিয়ারও বেশি। ঠিক যে তুমি কি তা অবশ্য আমি বলতে পারি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তুমি প্রিয়ারও অতিরিক্ত কিছু।'

লজ্জায় সুলতা হাসে, বলে, 'দ্যাখো, এত বাড়িও না। এতদিন বাইরের লোক স্ত্রৈণ বলেছে, এবার তাহলে আমিও বলতে শুরু করব।'

বিকাশ বলে, 'হুঁ, বলো না? গলা বুজে আসবে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালোবাসতে পারে না, তারাই পরকে স্ত্রৈণ বলে গাল

দেয়। তুমি কি ওকথা বলতে পারো?'

সুলতার চোখ ছলছল করিয়া আসে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালোবাসিতে পারে না তাহারা সুলতার অজানা জগতের মানুষ নয়। পাশের বাড়িতেই চরম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কি কান্নাই বৌটা এক-একদিন কাঁদে? ভালোবাসুক আর না বাসুক স্ত্রীকে যার অমনভাবে কাঁদিতে হয় সে দুর্ভাগা বৈকি?···

ভালোবাসার ভবিষ্যৎ ভাগবাটোয়ারা নিয়া রোজ তাহাদের তর্ক হয়।

সুলতা স্বীকার করে না তার ভালোবাসার সীমা আছে। ছেলেকে ভালোবাসা দিতে হইলে স্বামীর ভাগটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে—একথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

'তোমার জন্যে যে-ভালোবাসা সে তোমারই থাকবে গো, খোকার জন্য নতুন ভালোবাসা জন্মাবে। তুমিই বরং আমাকে আর তেমন—'

'দেখো! খোকাকে নিয়ে আমার দিকে যখন তাকাবারও সময় পাবে না —'

এমনই সব অর্থহীন কথার খেলা। অথচ ইহারই ভিতর দিয়া—দু-জনের যে-অনির্বচনীয় মিলন ঘটিয়া চলে, প্রেরণার মুহূর্তেও কি কোনো কবি কোনোদিন তার মানসীর সঙ্গে তেমন মিলনের স্বাদ পাইয়াছে?

—'যে কাঁথাটা ধরেছিলে শেষ হলো?'

একটু বাকি আছে। আজ হয়ে যেত, ঠাকুরঝি এমন ঠাট্টা শুরু করলে—'

'মিনুর খোকার জন্য মা আর কাঁদে না দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। কেন বলো তো?'

'তোমার খোকার পথ চেয়ে আছেন। তোমার যে খুকিও হতে পারে একথা কিন্তু মা-র মনেও পড়ে না!'

'তোমার পড়ে?—'

'আমি হার দিয়ে খোকার মুখ দেখবো সুলতা।'

'মা যে হার দেবেন ঠিক করেছেন!'

'ও, হ্যাঁ। মনে ছিল না। আমি তবে কি দেব বলো তো?'

'ওর মাকে একটু ভালোবাসা দিও।'

এমনিভাবে তাহারা কথার পিঠে কথা গাঁথিয়া চলে, কখন যে তাহা হাস্য-পরিহাসে দাঁড়াইবে, কখন গভীর আলোচনার রূপ নিবে কিছুরই স্থিরতা থাকে না। দু-জনের মনেই যেন স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোন ও এক স্তূপ রেকর্ড আছে, কীর্তনের পরেই কমিক গান বাজিয়া যায় এবং গ্রামোফোনের প্রথম শ্রোতা বালক-বালিকার মতো তাহাতেই তাহাদের সবিস্ময় পুলকের অন্ত থাকে না।

শেষরাত্রে হঠাৎ সুলতার ঘুম ভাঙাইয়া খোকা কার মতো দেখিতে হইবে এবং কি নাম রাখিলে সমবেতভাবে দু-জনের পছন্দের মর্যাদা থাকিবে, এ-আলোচনা আরম্ভকরা বিকাশের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে হয় না। কিন্তু দিন ঘনাইয়া আসার সঙ্গে তাহাদের ছেলেমানুষী আলোচনা কমিয়া যায়। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটিবার প্রতিক্ষায় সুলতার দেহ যেমন অস্থির-অস্থির করে, মনে তেমনই একটা একটানা ভয় বাসা বাঁধে। স্বামীর একটা হাত বুকে চাপিয়া সে অনেক রাত্রি অবধি নীরবে জাগিয়া থাকে, বিকাশ তাহার বক্ষের দ্রুতস্পন্দন অনুভব করে।

'ভয় কি সুলতা?'

সুলতা আরও শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

আত্মীয়-পরিজন সকলের মুখে অল্পবিস্তর চিন্তার লক্ষণ দেখা দেয়, বয়স্করা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে নানারকম পরামর্শ করেন, মন্থরগতিতে আগামী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে।

বিকাশের বিধবা মা, মা কালীর কাছে মানত করেন, ভালোয়

ভালোয় একটি খোকা দিও মা, খোকা দিও। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।

কোথা হইতে গোটাতিনেক মাদুলি সংগ্রহ করিয়া পুত্রবধূর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুধু কি মাদুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়? মা কালীর ঘাড়েও দায়িত্ব চাপাইয়া তিনি স্বস্তি খোঁজেন।

কি জানি কি হইবে? একবার ভালোয় ভালোয় হইয়া গেলে পরের বার অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। প্রথমবারই যত ভয়।

আপিসের কাজে বিকাশের মন বসে না, চলিতে চলিতে বার-বার কলম থামিয়া যায়, সময় যেন ভ্রূণভারবাহী মন্থর-গমনা অলস বধূ। বাহিরে কোনোদিন রোদ ওঠে, কোনোদিন মেঘের ছায়া পড়ে, কোনোদিন অবিশ্রাম ধারাপাত হয়। ফ্যানের বাতাসে কাগজ-পত্র মৃদুশব্দ করিয়া নড়িতে থাকে, চোখ বুজিলে মনে হয় কোরা তাঁতের শাড়ি পরিয়া সুলতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুলতার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য দূরে থাকাটাও বিকাশের কাছে আজকাল অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাবনার মধ্যে সুলতার সঙ্গ সে এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে পারে, মমতার এমন সব অভূতপূর্ব অনুভূতির সন্ধান সে পায় যে তাহার মনে হয় শুধু সুলতার নয়, নিজেরও অনেক আশ্চর্য গোপন পরি-চয় ধরা পড়িতেছে।

এ-অমৃত যে একদিন ভালোবাসার ভিত্তিগত দৈহিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল, বিকাশ আর তাহা বিশ্বাস করে না। তাহার মনে হয় বহুকাল ধরিয়া সে শুচিশুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিল, এতদিনে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রতি, মানুষের যুগ-ধর্মের প্রতি, বিকাশের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। স্ত্রীকে সে আজ সত্যই শ্রদ্ধা করে।

সুলতার মনে হয় সে যেন নেশা করিয়াছে। আনন্দের নেশা আতঙ্কের নেশা প্রাণধারণের নেশা।

স্বামীর অতিরিক্ত ভালোবাসার কথা একান্তে বসিয়া ভাবিতে গেলে কোথায় যেন তাহার একটু বাধিত, মনে হইত ইহাকে প্রাপ্য মনে করা অনুচিত, এত বেশি করিয়া পাওয়া অন্যায়। আজ আর পাওনার কাছে দাবিকে ছোট মনে হয় না। নিজের মূল্য নিজের কাছেই সুলতার আজ অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

দুপুরটা ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অলসভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া সুলতা চোখ বোজে। এই ঘরে সে তিন বছর বাস করিতেছে, তিন বছরের ইতিহাসে এ-ঘর যেন ঠাসা, বাতাসে যেন পুরানো মাটির গন্ধ।

এই ঘরে তার প্রথম স্বামী-স্পর্শ জুটিয়াছিল!

সেদিনের বুক-দুরুদুরু পুলক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আকাশের অশ্রু ছাঁকা সূর্যালোক যেমন আকাশের গায়েই রামধনু আঁকিয়া দেয়, আত্মীয়-বিচ্ছেদবেদনায় পরমাত্মীয়র সোহাগ মনে সেদিন তেমনই রঙ মিশাইয়াছিল; ভ্রূণস্পন্দনে যেন তাহারই চঞ্চল চেতনা!

তারপর একদিন দুপুরে খাইতে বসিয়া সুলতা খানিকক্ষণ মাখা ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করিল, শেষে পাংশুমুখে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

মৃন্ময়ী বলিল, 'ওকি বৌ? ভারি মাসে আবার কিসের অরুচি।'

স্নেহলেশশূন্য কণ্ঠে। এবং তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তার হৃদয়ে স্নেহ নাই, মমতা নাই, ঘুমানো আগ্নেয়গিরির মতো তার বুকভরা শুধু জ্বালা। স্বামী তাহাকে নেয় না, এই সেদিন পাঁচ বছরের ছেলেটা মরিয়াছে। সহ্যের অতিরিক্ত বলিয়া তাহার শোক আজ আর বেদনার ব্যাপার নয়,—মনের বিকার, হৃদয়ের রুক্ষতা।

সুলতা বলিল, 'আমার গা কেমন করছে ঠাকুরঝি—বড্ড খারাপ লাগছে।'

'বলো কি বৌ' বলিয়া মৃন্ময়ীর যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল একাগ্র দৃষ্টিতে সে ভ্রাতৃবধূর মুখখানি নিরীক্ষণ করিল। কতকাল পরে তাহার শুষ্ক চোখ দুটি আজ আবার জলে ভরিয়া উঠিতে চায়!

মুখ ফিরাইয়া নিয়া হঠাৎ অনাবশ্যক শব্দ সহকারে মৃন্ময়ী হাঁকিল, 'ওমা! মা শুনছ? বৌ-এর শরীর কেমন করছে দেখে যাও।'

মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'কি বৌমা, কি? কিরকম বোধ করছ?'

কিরকম যে বোধ করিতেছে সুলতা নিজেই তাহা বোঝে না, শাশুড়িকে বলিবে কি।

দেহের প্রত্যেকটি অণু যেন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাথাটা এমন ভারী যে মাটিতে না নামাইলে খসিয়াই পড়িবে বোধ হয়, অজস্র এলোমেলো চিন্তা জড়াজড়ি করিয়া মনের মধ্যে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে।

সে করুণস্বরে বলিল, 'কেমন যেন লাগছে মা, অস্থির-অস্থির করছে।'

মা চিন্তিতমুখে বলিলেন, 'কি জানি, এখনো কিছু বলা যায় না। ঘরে গিয়ে তুমি বরং শুয়েই থাকো বৌমা, খেয়ে আর কাজ নেই। ব্যথা-ট্যথা টের পাওয়ামাত্র আমায় কিন্তু জানিও বাছা, দাই ডাকতে হবে, বিকুর কাছে খবর পাঠাতে হবে—'

সুলতার ইচ্ছা হইল বলে, দাই ডাকিতে লোক যাক, বিকাশের কাছে লোক ছুটুক, যত কিছু আয়োজন দরকার সব সমাপ্ত থাক। ডাক্তার ডাকার কথাটা তো শাশুড়ি কই উল্লেখ করিলেন না? শুধু দাই-এর উপর ইহারা নির্ভর করিয়া থাকিবে নাকি?

বিকাশ বলিয়াছে, দরকার হোক বা না-হোক (ভগবান করেন যেন দরকার না-হয়) প্রথম হইতে একজন ডাক্তার আনিয়া বসাইয়া

রাখিবে। কিন্তু সে খবর পাইয়া আপিস হইতে আসিবার পূর্বেই যদি ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যায়? সে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে? যদি মরিয়া যায়?

মৃন্ময়ী তীব্রদৃষ্টিতে সুলতার মুখের ভাবপরিবর্তন দেখিতেছিল, ঠোঁট ভাঙিয়া হাসিয়া বলিল, 'বৌ-এর মুখ দেখেছ মা? যেন ফাঁসি যাচ্ছে। সারাজন্ম ছেলে বিইয়ে কাটবে, মেয়েমানুষের এতে এত ভয় কিসের শুনি?'

মা বলিলেন, 'আহা, তুই চুপ কর মিনু।'

মৃন্ময়ী উদ্ধতভাবে বলিল, 'কেন চুপ করব? হক্ কথা বলব তার আর চুপ করাকরি কি!'

সুলতা ছলছল চোখে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে থাকোগে। ভাত তো মুখেও করলে না, একটু গরম দুধ খাবে?'

সুলতা মাথা নাড়িল। মৃন্ময়ী বলিল, 'খোকা যখন হয়, আমার শাশুড়ি আমায় একবাটি দুধ গিলিয়েছিল মা। শেষে মরি আর কি বমি করে!'

সুলতা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই অকারণেই তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ও কি ঠিক সময়ে আজ আসতে পারবে? সকালবেলাই শরীর ভালো ঠেকছিল না, কেন বললাম না তখন?

ছোট ননদ সুধাময়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসিল, কানে মুখ রাখিয়া চুপিচুপি বলিল, 'বৌদি, সেই যে বলবে বলেছিলে, এবার বলো!'

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কিশোরী মেয়ের একি কৌতূহল। বিবাহের কথায় যে এখনো ভালো করিয়া লজ্জা পাইতে শেখে নাই, সে জানিতে চায় পৃথিবীর আলোবাতাসের ডাকে খোকা সাড়া দিতে চাহিলে জননীর কেমন লাগে!

মাংসের সীমানায় আলোর জন্মেরও পূর্বেকার যে-আদিম

অন্ধকার নিয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর আলো কোনোদিনই যে-অন্ধকারের নাগাল পায় না, চিতাগ্নির পথে যে-অন্ধকার আবার আলোর যবনিকার ওপারে চলিয়া যায়, সেই অন্ধকারে শিশুর অস্তিত্ব সুধার মনে জিজ্ঞাসা জাগায় না। জীবনের আরম্ভ তাহার কাছে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর,—আঁতুড়ে। সে শুধু জানিতে চায় ওই আরম্ভটা কেমন, শিশুর কাছে উহা কেমন লাগে। অকস্মাৎ চারিদিকে আলো ও শব্দের সমারোহ তাহার নিজের একদিন কেমন লাগিয়াছিল? যে মা হইতে বসিয়াছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সে এই দুর্বোধ্য ঝাপসা কৌতুহলের সমাপ্তি খোঁজে।

গতকল্য বেশ মনে পড়ে, গত বৎসর এতটুকু অস্পষ্ট নয়। এই উজ্জ্বলতা কমিয়া কমিয়া সীমান্তের কাছে স্মৃতি শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিছিন্ন ঘটনা, তাহার পরেই এক অদ্ভুত রহস্যভরা কুয়াশা।

সুধা জানিতে চায় ওই রহস্যের মধ্যে সে কি ছিল?

জবাব না পাইয়া তাহার রাগ হইয়া গেল। বলিল, 'বলবে না তো? আচ্ছা, না ই বললে।,

সুলতা বলিল, 'বলছি। বড় মাথা ধরেছে।'

সুধা হতাশ হইয়া বলিল' 'এই শুধু।'

'আর ভয় করছে।'

ভয়! মনে হইল এবার যেন সুধা তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছে। চোখ বড় বড় করিয়া সে বলিল, 'ভয় করছে বৌদি? ভারি আশ্চর্য তো!' বলিয়া কিশোরী মেয়েটি একমুহূর্তে গম্ভীর, বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বিকালের দিকে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, আজ রাত্রির অন্ধকারেই আকাশে একটি নূতন জন্মতারকা দেখা দিবে।

ক্লিষ্টস্বরে সুলতা বলিল, 'সুধা ভাই মাকে বলো ওঁর কাছে লোক যাক।'

সুধা বলিল, 'দাদার আসবার সময় হয়েছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।'

সুলতা খানিক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বাড়াবাড়ি করিতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু কি করিয়াই বা চুপচাপ থাকা যায়? ছেলের চেয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাটাই তাহার কাছে অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথাটা ইহাদের সে বোঝায় কেমন করিয়া?

খানিক পরেই সুলতা আবার বলিল, 'কিন্তু আপিস থেকে ও যদি কোথাও চলে যায় ভাই? কোনো বন্ধু যদি বায়স্কোপে ধরে নিয়ে যায়? কি হবে তাহলে?

মৃন্ময়ী সারা দুপুর বারবার ঘরের সামনে দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, সুলতার এ-কথাটা সে শুনিতে পাইল। উঁকি দিয়া বলিল, 'কি আর হবে তা হলে, পৃথিবী রসাতলে যাবে! সে পুরুষমানুষ, এসে তোমার কাছে কি করবে শুনি? আমরাও ছেলে বিইয়েছি বৌ, এমন বেহায়াপনা কখনও করিনি!'

সে অতীত কথা। মনে হয়, এজন্মে বোধহয় ঘটে নাই। কী যন্ত্রণার মধ্যেও বাহিরে স্বামীর অস্থির পদচালনার বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল আজ তাহা অস্পষ্ট মনে পড়ে মাত্র।

সেই খোকা আজ নাই, সেই স্বামী আর খবর নেয় না। অস্পষ্টভাবেও সেই শীতের রাত্রির কথা যে স্মরণ আছে ইহাই যেন আশ্চর্য। হয়তো আজ রাত্রে আর অস্পষ্ট থাকিবে না,—কে বলিতে পারে? বৌ যখন ব্যথায় কাতরাইতে আরম্ভ করিবে, তাহার চিত্তেও হয়তো অচেতনার স্পর্শ লাগিবে, বুকের মধ্যে চঞ্চলপদে একজন হাঁটিয়া বেড়াইবে, বিনিদ্র রজনী আর পোহাইতে চাহিবে না।

মৃন্ময়ীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সিঁড়ি ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাহার পা দুটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রোয়াকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল আজ রাত্রিটা কোথাও কাটাইয়া আসা যায় না? পাড়ার কাহারো বাড়িতে হোক, ভবানী-পুরে পিসিমার বাড়িতে হোক, এ বাড়ির সমারোহের সংবাদ যেখানে আজ পৌঁছিবে না?

ছোট বাড়ি, অন্দরের গা-ঘেঁষে বৈঠকখানা। ভিতরের দিকে দরজায় একটি মুখ উঁকি দিতেছিল, মৃন্ময়ীকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল, 'বিকুদা বাড়ি আছে?'

মৃন্ময়ী তীব্রকণ্ঠে বলিল, 'যান, যান আপনি। চাষা।'

এতক্ষণ অবধি ছাদে রোদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে কালিমার ছাপ পড়িয়াছিল, আরও একটু কালো হইয়া মুখখানা সরিয়া গেল। মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতলায় গেল,—কপালে সিঁদুর পরিতে। সিঁদুরের ফোঁটার অভাবে তাহার কপাল সুর-সুর করিতেছিল। কপালই বটে! সাদা হাড়ের উপরে খানিকটা টান করা সাদা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিঁদুরের টিপ পরিয়া মৃন্ময়ী আয়নায় মুখ দেখিল। মনে হইল কপালটা তাহার এমনই সাদা যে লাল সিঁদুরের চেয়ে কালো কাজলের ফোঁটা হইলেই যেন মানাইত ভাল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র পাঁচু টের পাইল বাড়ির আবহাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বারান্দায় স্টোভ জ্বলে নাই, বৈকালিক জলযোগের কোনো আয়োজন দেখা যায় না। একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে, প্রাইজ বিতরণের দিনে স্কুলে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আসিবার আগে যেমন হয়, তেমনই পশ্চিমের ছোট অন্ধকার ঘরখানা ইতি-পূর্বে একদিন পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এই অবেলায় দিদিমা আবার সে-ঘরের মেঝে পুঁছিতেছেন, দিদিমার মুখের ভাব অন্ধ-কার ঘরখানার মতোই সন্দেহজনক। বড় মাসির মুখের রুক্ষতা যেন বাড়িয়াছে, ছোট মাসি বসিয়া আছে মামীর শিয়রে।

কি শিথিল অবসন্ন মামীমার পা গুটাইয়া শুইবার ভঙ্গি। কাহাকেও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না, পাঁচু মুহূর্তমধ্যে সব বুঝিতে পারিল। বইখাতা হাতে বিস্ফারিত চোখে সে সুল-তার দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তেজনায় তাহার ছোট বুক-খানির মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল। ঘরে সে ঢুকিতে পারিল না।

চৌকাঠ ডিঙাইবার ক্ষমতা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুধা বলিল' 'কি রে পাঁচু!'

পাঁচু সলজ্জ হাসিয়া সরিয়া গেল। বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়া পাইল না কোন্‌দিকে যাইবে, এ-বাড়ির কোন্ ঘরে আজ তাহার কি প্রয়োজন।

মা-র জন্য পাঁচুর আজ সহসা বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা থাকিলে মামীমা তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারিত না।

দাই-এর কাছে খবর গিয়াছিল, একটা কাপড়ের পুঁটুলি হাতে পান চিবাইতে চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনের মোটা কাপড়খানা তাহার যেমন নোংরা, তেমনই দুর্গন্ধ। তা, কাজটাও তাহার অতিশয় নোংরা বৈকি।

হাতে মুখে সে অনেকগুলি উল্কির ছবি আঁকাইয়াছে, গায়ের রঙ এত কালো যে আর একটু কালো হইলে উল্কিগুলি দেখা যাইত কি না সন্দেহ।

কোনোদিকে দৃক্‌পাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিতে করিতে তাহার প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল, 'গিন্নিমা কুথায় গো?'

মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দাই বলিল, 'এস্‌লাম তো গিন্নিমা, উদিকে যে আবার ফ্যাঁকড়া বাঁধল।'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'কি আবার ফ্যাঁকড়া বাধল বাছা?'

'হোই ও-পাড়ার ভূষণবাবুর মেয়েরও আজ ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি টানাটানিই না করলে!—দত্তমশায় নিজে, লজ্জায় মরি গিন্নিমা! বললে, তুমি থাকলে বুকে ভরসা পাই রাখীর মা, ভালোয় ভালোয় খালাস করে দাও, পঁচিশ টাকা নগদ আর তোমার যা রোজ বাঁধা আছে দু-টাকা করে—'

একটু নিরুপায় হাসি হাসিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাই মা-র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, 'ওইতো বাছা তোমাদের দোষ। একেবারে শেষ সময়ে মোচড় দিয়ে পাওনা নিতে চাও। দেনাপাওনার কথা তোমার সঙ্গে তো হয়েই আছে কবে থেকে?'

দাই বলিল, 'কথা হয়ে থাকলেই কি গরিবের চলে মা! যেখানে দু-টাকা বেশি মিলবে আমাদের সেইখানেই নাগতে হবে।'

মা-র সাংসারিক অভিজ্ঞতাও কম নয়, বলিলেন, 'তবে তুমি সেইখানেই যাও বাপু, আমরা অন্য লোক দেখছি। সিধুর বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে।'

শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। এমন বিপর্যয় ব্যাপার ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শ্বাশুড়ি তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য এমন করিতেছেন! যে-টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে! প্রথমেই পাওনা নিয়া গোল বাধিলে দাই কি আর মন দিয়া নিজের কর্তব্য করিবে? আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধটা দাই যদি তার উপরেই নেয়?

সুলতার মনে হইল, পরমাত্মীয়ের মৃত্যুকালে এ যেন জীবনের মূল্য নিয়া ধন্বন্তরির সঙ্গে দর কষাকষি করা!

মনে মনে সে স্থির করিয়া ফেলিল, দাইকে এক সময় চুপিচুপি জানাইয়া দিবে, টাকার ব্যাপারে তাহার কোনো দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় সুলতা গোপনে তাহার হাতে দিবে, সে যেন তাহাকে সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে কৃপণতা না করে, এবারের মতো সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভবিষ্যতে—

মা আর মরিয়া গেলেও হইবে না।

বায়োস্কোপ নয়, বিকাশ খেলা দেখিতে গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিতে তাহার সাতটা বাজিয়া গেল।

কালও যে খেলা দেখিয়া এমনি সময়ে সে বাড়ি ফিরিয়াছিল

সেকথা বিকাশের মনে পড়িল না, বিশেষ করিয়া আজকার দিন-টিতে দেরি করার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্তি গোপন করিবার কোনো চেষ্টাই সে করিল না।

'আমায় একটা খবর পাঠাতে পারলে না কেউ? কি যে ব্যবস্থা তোমাদের!'

মা বলিলেন, 'খবর পাঠাবার যখন দরকার হলো বাবা, তোর ছুটির সময় হয়েছে। কোথায় তোকে খ‍ুঁজে বেড়াত?

বিকাশ যেন এই কৈফিয়ত চাইছিল!

মা আবার বলিলেন, 'এই তো গেল আঁতুড়ে, এখনো কিছুই নয়।'

বিকাশ জামাকাপড় ছাড়িল না, বিরসমুখে জলচৌকিতে বসিয়া রহিল। এখনো কিছুই নয় সত্য, কিন্তু তাহার দুঃখ অন্য কারণে। সুলতার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহার হইল না, এমন ক্ষতি এ-জীবনে আর সম্ভব নয়। ও-ঘরে ঢুকিবার আগে তাহার নিকট হইতে শেষ সাহস, শেষ সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া নিবার কি অধীরভাবেই না জানি সুলতা প্রতীক্ষা করিয়াছিল! তাহাকে এতখানি প্রয়োজন আর কোনোদিন একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যও কি সুলতার হইবে!

সুলতার নির্ভরশীলতার চরম অভিব্যক্তি অগোচরে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া বিকাশের ক্ষোভের সীমা রহিল না।

ও-ঘর হইতে সুলতা বাহির হইবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া, সন্তানের জননী এই পরিচয়ের কাছে তাহার প্রিয়া ও পত্নী সংজ্ঞা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যাক্, তাহা অপ্রিয় নয়, কিন্তু এই মহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকট হইলে প্রিয়ার বিবর্ণ কপালে যে ক্ষুদ্র একটি চুম্বন দেওয়া হয় নাই, সে আপসোস এ-জীবনে আর ঘুচিবে না।

সুধাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বিকাশ বলিল, 'বৌদিকে বল গে আমি এসেছি।' সুধা আঁতুড় ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'বৌদি জানে!'

জানে! কেমন করিয়া জানিল? সে জোরে কথা বলে নাই, শব্দ করিয়া হাঁটে নাই, তবু খবর পেঁাছিল? বিকাশ চাহিয়া দেখিল ঘরে কি আলো জ্বালা হইয়াছে, জানালাটা পর্যন্ত ভালো করিয়া আলো হয় নাই। আলোর কার্পণ্যে তাহার রাগ হইয়া গেল। সে ভাবিল, আর আধঘণ্টার মধ্যে ও-ঘর যদি ইহারা ভালো ভাবে আলোকিত না করে, সে নিজে ডে-লাইট ভাড়া করিয়া আনিবে।

ভেতরে কে আছে রে সুধা?'

মা, ও-বাড়ির পিসিমা আর দাই।'

'মিনু?'

'দিদির শরীর ভালো নয়, শুয়েছে।'

বিকাশের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ শুভ নয়। মৃন্ময়ীকে সে ভালোবাসে, তাহার জীবন সর্বদিক দিয়া ব্যর্থ হইবার পর করুণার রসে সে মমতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুলতার সন্তান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাইবার পর তাহার মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল, অন্য কাহারো কাছে ধরা না পড়িলেও তাহা বিকাশের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ মৃন্ময়ীর শরীর খারাপ হওয়ায় সবটুকু ইতিহাস অনুমান করিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সুলতার শুভকর বিপদে একি অমঙ্গলের ছায়াপাত!

জুতা খুলিয়া বিকাশ বারান্দার একপাশে রাখিয়া দিল। জামা খুলিয়া কলতলায় মুখহাত ধুইয়া আবার জলচৌকিটাতেই বসিল। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে। তামাকের তৃষ্ণাও যেন ক্ষুধার মতোই অবুঝ। আপিস যাওয়ার সময় সুলতাকে সে নারকেল কোরাইতে দেখিয়া গিয়াছিল। তক্তি-টক্তি কিছু করিতে পারিয়াছিল কি না কে জানে! করিয়া থাকিলেও চাহিয়া খাইতে বিকাশের ইচ্ছা হইল না। ক্ষুধার জ্বালা সামান্য, সুলতা অমন কষ্ট পাইতেছে, সামান্য ক্ষুধার জন্য সে ব্যস্ত হইবে? সুলতার যন্ত্রণা তাহার খাওয়া না-খাওয়ার উপর নির্ভর করে না, খাওয়ার স্বপক্ষে এ-ছাড়া আর কি যুক্তিই বা আছে।

রান্নার ভারটা এবেলা সুধার উপরেই পড়িয়াছিল। মুখ তাহার গম্ভীর ও চিন্তাভারাক্রান্ত। একটা বাটিতে মুড়ি আর কয়েকটা নারকেল-সন্দেশ আনিয়া সে দাদার হাতে দিল, তামাকও সাজিয়া আনিল। তারপর অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মতো চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিকে একবার দেখবে দাদা? সারাক্ষণ তোমায় খুঁজছিল।'

বলিতে বলিতে দাদার প্রতি উচ্ছ্বসিত মমতায় কচি মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'থাক্।'

'আচ্ছা।' বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সুধা চোখ মুছিতে লাগিল।

দাদার দুঃখ এ-বাড়িতে তাহার চেয়ে কে ভালো করিয়া বোঝে! সারাদিন খায় নাই, কিন্তু কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে দাদা মুখে খাবার তুলিতেছিল? হুঁকা হাতে নিয়া কতক্ষণ টান দিতে খেয়াল থাকে নাই? সমবেদনায় সুধার বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ডালে কাঁটা দিতে দিতে মুখ চোখ বিকৃত করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ ঠেকাইয়া রাখিল। মনোবৃত্তির এমন ভয়ানক বিপর্যয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে আর দেখা দেয় নাই। প্রথমে এতটা হয় নাই, দাদার ম্লান মুখ ও ছলছল চোখ দেখা অবধি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে তামাক টানিতে টানিতে চারিদিকে চাহিয়া বিকাশ ক্রমাগতই মনে মনে আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল। এই সময়টির যে-কল্পনা সে মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। সেরকম ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি হইতেছে কই? সমস্তই ধীর মন্থর গতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে। পুরাতন কাপড় নিতে আসিয়া মা পরম নিশ্চিন্ত মনেই যেন চাকরকে জিনিসের ফর্দ লিখিয়া পয়সা বুঝাইয়া দিলেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোসগিন্নির সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ করিলেন, রান্না সম্বন্ধে সুধাকে কয়েকটা উপদেশও

দিলেন। মৃন্ময়ী উপরে শুইয়া আছে, পাঁচু বোধহয় তার ছোট আলোটি জ্বালিয়া অঙ্ক কষিতে বসিয়া গিয়াছে, বেচারির হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা আসন্ন। আঁতুড়ের দিক হইতে কাঠকয়লা পুড়িবার একটা গাঢ় গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। দাই-এর অবিশ্রান্ত বকুনি ও মাঝে মাঝে সুলতার মৃদু কাতরানি ছাড়া ও-ঘরে শব্দ নাই চাঞ্চল্য নাই।

অথচ এ কি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার! পুরা দশটি মাস ধরিয়া বিধাতা স্বয়ং যে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজন করিয়াছেন, এই কি তাহার উপযুক্ত সমারোহ? বিধাতার খেলায় তাড়াহুড়া নাই বলিয়াই কি সকলে চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কোনোমতে ধৈর্য ধরিয়া আছে?

এই চিন্তার শেষটা নিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে যাহা ঘটিবার ধীরে সুস্থে তাহা ঘটিবেই এ-কথা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ আছে বিকাশ নিজেও সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিকাশের মনে হইল তাহার দুশ্চিন্তা ও সুলতার যন্ত্রণা যে অশেষ নয় এই কথাটাই সে বাড়িতে পা দেওয়া অবধি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত বারোটা-একটার মধ্যে সব চুকিয়া যাইবে আশা করা যায়। যত কষ্টই পাক সুলতা, বারোটা একটা তো একসময় বাজিবেই আজ! সাতাশ বৎসর ধরিয়া তাহার জীবনে সংখ্যাহীন রাত্রি পোহাইয়াছে, আজিকার রাত্রিও পোহাইবে বৈকি!

আগামী কল্যের যে-সূর্যালোকে সে সন্তানের মুখ দেখিবে, সে-সূর্যকে মাটির পৃথিবী কয়েক ঘণ্টার জন্য আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

জোরে জোরে হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বিকাশ জামাটা তুলিয়া নিয়া দোতালায় গেল। নিজের ঘরে পা দিয়াই তাহার চমক লাগিল। এখানেও কে যেন অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে।

ঘরের মেঝেতে আলোটা কমানো ছিল, বাড়াইয়া দিয়া ঠাহর করিয়া বিকাশ দেখিতে পাইল, একটা বালিশ আঁকড়াইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পাঁচু থরথর করিয়া কাঁপিতেছে এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার পিঠে হাত দিয়া বিকাশ বলিল, 'তোর আবার কি হলো রে পাঁচু ?'

পাঁচু তৎক্ষণাৎ মামাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, 'ভয় করছে মামা।'

'কেন, ভয় করছে কেন ? যা, ভয়ের কিছু নেই।'

পাঁচু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, 'একটা শাঁকচুন্নি ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুল বাঁধছিল, একটা ভূত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

ছেলেটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, ভয় সে সত্যই পাইয়াছে, কিন্তু কারণটা বিকাশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খোলা জানালা দিয়া ছাদের খানিকটা দেখা যায়, অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় মন্দ আলো হয় নাই। ওই ছাদে কিসের উপলক্ষে আজ শাঁকচুন্নির আবির্ভাব হইল, তাহার চুল বাঁধা দেখিতে ভূতই বা আসিল কোথা হইতে ? কিন্তু যে কারণেই ভয় পাইয়া থাক, পাঁচুর ভয় ভঙানো দরকার।

'তুই ছায়া দেখেছিস পাঁচু। চল্ দেখবি; ছাদে কিচ্ছু নেই।'

পাঁচু সভয়ে বলিল, 'না মামা! কিন্তু বিকাশ তাহা শুনিল না, পাঁচুকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাদের দিকে চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তোর ভয় কিরে ? ভূতের আমি কান মলে দেব।'

ছাদে গিয়ে দেখা গেল শাঁকচুন্নির কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়। চুল এলাইয়া দিয়া মৃন্ময়ী অসম্বৃত বেশে ছাদের আলিসার সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। পায়ের শব্দেও সে মুখ তুলিল না।

'তুই যে এখানে মিনু ?'

মৃন্ময়ী কলহের সুরে বলিল, 'কেন, এখানে কি আমার থাকতে নেই নাকি ?'

বিকাশ বলিল, 'মিথ্যে চটিস্ কেন? পাঁচু বড় ভয় পেয়েছে। মাথা ধরা কমাতে তুই ছাতে বেড়াচ্ছিলি, ও মনে করলে আমাদের বাড়িতে আজ একটা শাকচুন্নিই বা এল। যে ফর্সা কাপড় তুই পরিস্!'

মিনু ঝাঁঝালো সুরে বলিল, 'এবার থেকে ময়লা কাপড় পরব। ধোপার পয়সা দিতে তোমার কষ্ট হয় জানতাম না দাদা।'

বিকাশ অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময়ীর মেজাজ সবসময় ভালো থাকে না, কিন্তু এভাবে কলহ করাও তাহার স্বভাব নয়। তথাপি সকৌতুকে হাসিয়াই বিকাশ বলিল, 'হয়ই তো কষ্ট। তোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোর ভূতটা কই রে?'

মৃন্ময়ী চমকাইয়া উঠিল, 'ভূত! ভূত কি?'

'পাঁচু দেখেছে। তুই বেড়াচ্ছিলি, একটা ভূত এসে তোকে জড়িয়ে ধরল।'

মৃন্ময়ী হঠাৎ যেন খেপিয়া গেল, 'তুই দেখেছিস পাঁচু? মিথ্যেবাদী হারামজাদা, দেখেছিস তুই!'

চাঁদের আলোয় তাহার গালে জলের দাগ চকচক করে, চোখ যেন পাগল মেয়ের রাগ করা চোখ। মনে হয়, পাঁচুকে সে আঘাত করিবে। কিন্তু হঠাৎ সে সুর বদলাইল।

'ওটাকে ভূত মনে করেছিল বোধহয়।'

মৃন্ময়ী নিজের ছায়াটি দেখাইয়া দিল। একটি হ্রস্ব বাহু বাড়াইয়া ছায়াও তাহার কথায় সায় দিল।

পাঁচুকে নিচে নামাইয়া দিয়া বিকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিল, 'কি ভাবছ শুনি?'

'ভাবছি পাঁচু কেন ভয় পেল। তোকে তো ও কতদিন অন্ধকার ছাতে ঘুরতে দেখেছে, আর আজ এমন জ্যোৎস্না। এও কি স্থূলতার দোষ রে?'

মৃন্ময়ী শুষ্কস্বরে বলিল, 'তাছাড়া কি?'

বিকাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চল্ মিনু, আমারা নিচে যাই।'

'নিচে গিয়ে কি করব? তোমার বৌ-এর সেবা?'

'করলে কি তোর পাপ হবে? বড় নির্লজ্জ তুই। বড় ছোট মন তোর।'

এমন কঠিন কথা দাদার কাছে মৃন্ময়ী জীবনে আর শোনে নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল!

'বৌকে আমি হিংসা করি না দাদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, একটুও হিংসা করি না।' বিকাশ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, সংক্ষেপে শুধু বলিল, 'তা জানি। চল্ নিচে।'

রাত ন'টায় সুলতা চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, থামিল এগারোটার সময়; একেবারে অজ্ঞান হইয়া। বিকাশ সভয়ে বলিল, 'ওকি হলো? মরে গেল নাকি ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন, 'যান মশাই, আপনি রাস্তায় যান।' বিকাশ মিনতি করিয়া বলিল, 'আপনি আর একবার দেখে আসুন ডাক্তারবাবু। এমন আচমকা চুপ করে গেল, আমার ভালো বোধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার উঠিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন, অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, সুলতা শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

'অজ্ঞান!'

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা পাগল তো আপনি! আপনার জন্য দরকার মতো উনি অজ্ঞানও হতে পারবেন না?'

বিকাশ ছটফট করিতেছিল, এবার বসিল। কোলাহল সমারোহ নাই বলিয়া সন্ধ্যায় সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন আর ও-বিষয়ে নালিশ করিবার কিছু নাই। সুলতা একাই সমারোহের সীমা রাখে নাই।

সমস্ত বাড়িটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুলতা হয়তো আর শব্দ করিবে না, এ—স্তব্ধতা ভাঙিবে একেবারে শঙ্খ-ধ্বনিতে,—যদি ছেলে হয়। শাঁখ সম্ভবত মৃন্ময়ীই বাজাইবে। শঙ্খ হাতে সেই যে সে প্রহরীর মতো আঁতুড়ের দরজায় বসিয়াছিল, একবারও সেখান হইতে নড়ে নাই।

ভীত পাঁচুর সঙ্গে সুধাকেও শুইতে হইয়াছিল, তাহারা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অবসাদের গাঢ় ঘুম, কাল সকালের আগে টানিয়া তুলিলেও তাহাদের ঘুম ভাঙিবে না। সুস্থ সানন্দ-চিত্তে কাল তাহারা নবাগতকে দেখিবে। কিন্তু আজিকার অভিজ্ঞতা তাহারা ভুলিবে না কোনোদিন। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খাপ খাইতে হয়তো ক্রমাগত রূপান্তর নিবে, কিন্তু কখনো বিস্মৃতিতে তলাইয়া যাইবে না।

হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বিকাশ ভাবিতে লাগিল, সমস্ত জীবন মানুষ দুঃখ ভোগ করে, রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন? এই অনাবশ্যক বীভৎসতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায়?

খোকা আসিবে আসুক, কিন্তু এ যে বর্গী আসারও বাড়া!

ফাঁদ

সুভদ্রার বাবা একটি নাম-করা যাত্রার দলে তবলা বাজাইত। সেই যাত্রার দলেই বার-তের বছর বয়স পর্যন্ত সুভদ্রা কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। কৃষ্ণ সাজিয়া গোপিনীদের পাকা পাকা কথা ও মিষ্টি মিষ্টি গান শোনানো বন্ধ করিতে করিতে সুভদ্রার বয়সটা একটু বেশি হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় বন্ধ করিয়া বাড়ি পাঠানোর কথা তুলিলেই সুভদ্রা খেপিয়া যাইত। শেষপর্যন্ত বাড়ি অবশ্য তাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ না সাজিয়াই একসঙ্গে পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম আরম্ভ করায় কলঙ্কের আর সীমা রহিল না। আরেকজনের সঙ্গে সুভদ্রা তখন একদিন গেল পালাইয়া। পালানোর সময় কোনো আপনজনের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্য তার ছিল না, কিন্তু পালানোর আগে যার সঙ্গ ছাড়া সে একটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না ভাবিয়াছিল, দু-দিনের মধ্যে তাকে দেখিলেই তার সমস্ত শরীর রাগে শির্‌শির্‌ করিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া সে তাই গিয়া হাজির হইল দূরের এক গ্রামে তার দিদির কাছে। সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গান গাহিয়া সকলকে সে মুগ্ধ করিয়া দিল, আর একটু ভাব করিল ভগ্নীপতির সঙ্গে। সে-খেলা ভগ্নীপতি বুঝিত না যে-খেলায় শুধু পরস্পরের মন ভুলানো, আর সব আছে কিন্তু ধরা দেওয়া নাই। একদিন তাই অসময়ে জোর করিয়া সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরায় সেটা দিদির চোখে পড়িয়া গেল।

কিছু দূরের একটি গ্রামে মহেন্দ্র নামে ভগ্নীপতির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সদ্য সদ্য বৌ মরিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বড় ভাব হইয়া গেল সুভদ্রার। ভয়ানক বদ-

মেজাজি মানুষ মহেন্দ্র, লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তার শরীর আর শরীরে ষাঁড়ের মতো জোর। মেয়েমানুষ যে মোলায়েম জীব এটা বোধহয় তার জানাই ছিল না। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠুর পৌরুষ, বীভৎস ভালোবাসা আর বাস্তব দরদ যেন সাবান দিয়া আছড়াইয়া কাপড় কাচার মতো সুভদ্রার মনের ছেলেমানুষী ময়লা সাফ করিয়া দিল। মনের আনন্দে সুভদ্রা বৌ হইয়া কাটাইয়া দিল কয়েকটা বছর।

তারপর আবার তার মনটা কেমন করিতে লাগিল একটা অজানা কিছুর জন্য। মহেন্দ্রের আলিঙ্গনে শিহরণ জাগার বদলে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মনে হইতে লাগিল, রসিক নামে যে রোগা লম্বা ভীরু ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে, তার কাছে কি মন-কেমন-করার ওষুধ আছে? সাধন বৈরাগী নামে যে রূপবান পুরুষটা তার মন ভুলানোর চেষ্টায় নাওয়া-খাওয়া ছাড়িয়াছে, সে কি তাকে দিতে পারিবে সে যা চায়?

একদিন মাঝরাত্রে সুভদ্রা ধরা পড়িয়া গেল। রাশি রাশি মেঘে ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল টিপিটিপি, মোলায়েম একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সারাদিনের গা-জ্বালানো গরমের পর একেবারে অচেতন হইয়া ঘুমানো উচিত ছিল মহেন্দ্রের। আগের রাত্রে গরমে সিদ্ধ হইতে হইতেও সে মরার মতো ঘুমাইতেছিল, সুভদ্রা কখন উঠিয়া গিয়া কখন বিছানায় ফিরিয়া আসিয়াছিল কিছুই টের পায় নাই। দু-চারটি রাত্রি বাদ দিয়া তার আগের আরও পাঁচ-সাতটি রাত্রেও টের পায় নাই। আজ যে কেন তার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হয়তো জাগিয়াই ছিল, কে বলিতে পারে। একবার ঘুমাইলে মহেন্দ্রের ঘুম সহজে ভাঙে না। উঠিয়া যাওয়ার সময় সুভদ্রা আস্তে তার গায়ে একবার ঠেলাও দিয়াছিল। গায়ে ঠেলা দেওয়ায় যে জাগে নাই, কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতে তার ঘুম তো ভাঙিবার কথা নয়।

রসিক গায়ে জড়াইয়া আসিয়াছিল ছেঁড়া একটা সস্তা কম্বল।

ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কম্বল জড়ানো সেই চেনা মানুষটিকে দেখিয়া সুভদ্রা হয়তো মূর্ছা যাইত। তার বদলে বর্ষা বাদলের রাত্রে ভালোবাসিয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে বলিয়া রসিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাকে সে টানিয়া নিয়া গেল উঠানের দক্ষিণে ধানের মরাইটার গা-ঘেঁষা ছোট আটচালার নিচে। আট-চালার অর্ধেকটা ভরিয়া ছিল চ্যালানো আম কাঠে আর বাকি অর্ধেকটা ভরিয়া ছিল চাষের যন্ত্রপাতি আর ভাঙা গোরুর গাড়ির চাকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুমড়ানো কেনেস্তারা পর্যন্ত রকমারি জঞ্জালে। তার মধ্যে একটু স্থান করিয়া রসিকের গায়ের কম্বল বিছাইয়া তারা বসিয়াছিল।

তারপর রসিকের বুকে মাথা রাখিয়া ভৎসনার সুরে সুভদ্রা সবে বলিয়াছে, 'আজ আবার কেন এলে শুনি মুখপোড়া ?'

আর আবেগ ও আবেদনে কাঁদো-কাঁদো গলায় রসিক সবে জবাব দিয়াছে, 'না এসে থাকতে পারলাম না, মাইরি বলছি—'

এমন সময় সেখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির। দু-জনকেই মহেন্দ্র সম্ভবত খুন করিয়া ফেলিত, কিন্তু নাগাল সে পাইল না একজনেরও। লম্বা রোগা বাইশ বছরের ছোকরা রসিক চোখের পলকে উধাও হইয়া গেল, আর স্বভাব খারাপ হইলেও ঘরের বৌ এত রাত্রে ঘরেই থাকিবে জানিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া গেল রসিকের পিছনে। সেই অবসরে গোয়ালের পিছন দিয়া সুভদ্রা পালাইয়া গেল উলটা দিকে।

সেদিকেও ঘুমন্ত গ্রাম ছিল অনেক দূর অবধি ছড়ানো, কুকুর ডাকিতেছিল এদিকে-ওদিকে, দূরে শোনা যাইতেছিল চৌকিদারের হাঁক আর জমকালো ভেজা অন্ধকার ভরাট করিয়া খেয়ালের নাগাল ছড়াইয়া উঠিয়াছিল ব্যাঙের গানের একটানা আওয়াজ। সোহাগী বৌ রঙিন শাড়ি পরিতে পায় বলিয়া আর রঙিন কাপড় অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মতো সহজে চোখে পড়ে না বলিয়া নিজেকে সুভদ্রার মনে হইতেছিল ভাগ্যবতী !

গ্রামের শেষ বাড়িটি শুধু গোটা দুই ভাঙা ঘর, তারই একটিতে এত রাত্রে একজন গান গাহিতেছিল। চেনা চলতি গান, সুভদ্রার নিজের গান। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল। খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জনের জন্য তখন সে যে গানটি গাহিত, ভাঙ্গা মোটা গলায় ভুল সুরে কথা বদলাইয়া গাহিতেছে বটে অদৃশ্য গায়ক, কিন্তু আবেগ আছে লোকটার।

আবেগভরা লোকগুলি বড় অধীর হয়। ভিজা শাড়িখানা গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে, দেখিবামাত্র হয়তো সাপটাইয়া ধরিবে। ওভাবে কেউ সাপটাইয়া ধরিলে বড় খারাপ লাগে সুভদ্রার। গা বমি-বমি করে, দম আটকাইয়া আসে, মনে হয় সে যেন হঠাৎ এগার বছরের মেয়ে হইয়া গেছে আর যাত্রা দলের সেই যুধিষ্ঠির শেষরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বেশধারী তাকে আসরের খানিক তফাতে একটা ছোট আটচালার নিচে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এক হাতে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে আর আরেক হাতে তাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কাছি দিয়া বাঁধার মত।

কিন্তু উপায় ছিল না। এত রাত্রে কে আর তাকে খাতির করিবে। সুভদ্রাকে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সাধন বৈরাগী মূর্ছা গেল না, দু-চোখ বড় বড় করিয়া গানের বদলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুভদ্রা বলিল, 'আমি গো আমি।'

তখন সাধন বৈরাগী শান্ত হইল। কিন্তু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল অল্পক্ষণের মধ্যেই, আনন্দ উত্তেজনায়।

প্রথমে সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, রসিকের জন্য বোধহয় একটু মন কেমন করিবে। একটু যেন পছন্দ হইয়াছিল রসিককে তার, দু-একদিন গভীর রাত্রে তার যেন মনেও হইয়াছিল, বেতালা বাঁশির সুরে জানান দিয়া আজ কি রসিক আসিবে? ভাসা-ভাসা একটু রসজ্ঞান ছিল রসিকের, দুপুর রাতের গোপন মিলনে মাঝে মাঝে

একটু রসের সঞ্চারও যেন সে করিতে পারিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া যেভাবে তার মন কেমন করিয়া আসিয়াছে, এখনও তেমনি-ভাবে মন কেমন করিতে লাগিল বটে, সেটা রসিকের জন্য নয়। স্বামীর ঘরে ফেলিয়া আসা শাড়ি-গয়নার মতো রসিকও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু আপসোসও সুভদ্রার নাই। রসিক বলিয়া কেউ কি কোনোদিন তার মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বর্ণনা করিত, আসিবার সময় কোনো বাড়িতে নতুন বর ও বধূর ঘরে বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়া একজনকে কিভাবে আর একজনের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, আর শুনিতে শুনিতে তার মনে হইত সে যেন হালকা হইয়া গিয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, চাঁচের বেড়ায় ঘেরা চারকোনা জেলখানায় জোরালো দুটি বাহুর বন্ধন যেন তার আর নাই।

মনটা সুভদ্রার খুঁতখুঁত করে, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। রসিকও শেষপর্যন্ত তাকে ফাঁকি দিল, এতটুকু স্থান দাবি করিতে পারিল না তার মনে।

সাধন বৈরাগীর চেহারাটি বড় সুন্দর। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই সুভদ্রা তীব্র বিদ্বেষ আর হিংসা অনুভব করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল এই লোকটাই বুঝি জীবনযুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তারপর সাধনের অনেকদিনের প্রাণপাত সাধনার পুরস্কারস্বরূপ দূর হইতে একটু-একটু ভাব করিয়া এতকাল তাকে শুধু সে যন্ত্রনাই দিয়া আসিয়াছে। এখন হঠাৎ একেবারে ধরা দিয়া, অনেক দূরের অচেনা এক শহরে অজানা মানুষের মধ্যে ছোট একটি টিনের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করিবার মতো ভয়ানকভাবে ধরা দিয়া, সুভদ্রা দেখিল লোকটাকে সে যেরকম ভাবিয়াছিল সে মোটেই সেরকম নয়। বিদ্বেষ বা হিংসার কোনো কারণ নাই, বরং রীতিমতো অবজ্ঞা করা চলে। যে জোরালো আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা সে করিয়াছিল সেটা জোয়ারের মতো নয়, কলের ফোয়ারার মতো। তাও আবার সে-উৎসের ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় কম,

কলটাও গিয়াছে বিগড়াইয়া, হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে উথলাইয়া উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়ে। শুধু চেহারার টানে অনেক মেয়ে আসিয়া তার রসটুকু শুষিয়া নিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। আর রাখিয়া গিয়াছে অহংকার, স্বার্থপরতা আর পাগলামি, যেসব কোনোদিন কোনো মেয়ের কোনো কাজেই লাগে না।

সুভদ্রা হতাশ হইয়া ভাবিল, তাইতো!

সে-রাত্রে ভিজা রঙিন শাড়িটি ছাড়িয়া সুভদ্রা সাধন বৈরাগীর গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়াছিল। পরদিন পথে তার জন্য দু-সেট শাড়ি ও শেমিজ কিনিয়া গেরুয়া রঙে ছাপাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। তখন দু-জনকে দেখিয়া মানুষের মনে হইয়াছিল, স্বর্গের কোনো দেবতা বুঝি একটি অপ্সরাকে সেবাদাসী করিয়া মর্ত্যলোকে বেড়াইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

এখানে—ওখানে যে ক'টা দিন তারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত লোক সাগ্রহে তাদের সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রণামীও দিয়াছে। সুভদ্রার বড় ভালো লাগিয়াছিল সে-জীবন। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে জানে। পথ চলিতে আলস্য বোধ করিলে একটা গোরুর গাড়িকে থামাইয়া উঠিয়া বসিলেই হইল। বাঁধানো বড় সড়কে একদিন দামী একটা মোটরগাড়ি দাঁড় করাইয়া দু-জনে উঠিয়া বসিয়াছিল, হাওয়ার বেগে চল্লিশ মাইল পথ পার হইয়া গিয়া পৌঁছিয়াছিল সদরে। ক্ষুধা পাইলে ময়রার দোকানে খাবার চাহিয়া খাইলেই হয়, মুদির দোকানে চালডাল চাহিয়া গাছতলায় রাঁধিলেই হয়, নয়তো গৃহস্থের বাড়ি গিয়া বলিলেই হয়, আমরা আসিয়াছি, অন্ন দাও। পয়সা দরকার হইলে, দু-চার দশজনের কাছে চাহিলেই চলে। আশ্রয় তো আছে সর্বত্র, মুচির ভাঙা ঘরে নোংরা মেঝেতে সঙ্গের কম্বল বিছাইয়া চামড়ার গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, ফুল ও চন্দনের গন্ধভরা মন্দিরের বাহিরে অতিথ-শালায় জীবন্ত মানুষের ভাপ্‌সা গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও

ঘুমানো যায়, চোর ডাকাত কি খুনির আস্তানা সে-বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আশ্রয় নেওয়া যায় বড়লোক গৃহস্থের বাড়িতে। গেরুয়াধারী নরনারীর তো সম্পদ কিছু থাকে না পুণ্য ছাড়া, যা থাকে তার উপরেও তো লোভ চলে না, কামনাও করা চলে না সুন্দরী সন্নাসীকে। তাতে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। এমন নির্ভর নিশ্চিন্ত বাধাবন্ধনহীন সহজ সরল জীবন-যাপনের সুযোগ থাকিতে মানুষ যে দম আটকাইয়া পচিয়া মরে ঘরের মধ্যে!

কিন্তু সাধন বৈরাগী বলিয়াছে, 'উঁহু, এক জায়গায় স্থিত হয়ে না বসলে কি চলে?'

সুভদ্রা যদি বলিত খুব চলে, সাধনকেও অবশ্য তা মানিয়া নিতে হইত। কিন্তু মনমরা, বিরক্ত আর নিরুৎসাহ সঙ্গী যদি সারাদিন প্যানপ্যান করে কানের কাছে আর মুখ ভার করিয়া থাকে চোখের সামনে, মুক্তিও কি মানুষের ভালো লাগে? এই শহরে তাই তারা নীড় বাঁধিয়াছে।

সুভদ্রা ভাবিয়াছে, আর যাই হোক, যা খুশি তো করা চলিবে এখানে, পরের কর্তালি, পরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিধিনিষেধ তো তাকে ঘেরিয়া থাকিবে না।

ঘর বাঁধিলে রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধন বৈরাগী বলিল, 'ভিক্ষে করা চলবে না কিন্তু।'

কোনোরকমে দিন কাটানোর সঙ্গতি সাধন বৈরাগীর ছিল, তার মা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে সে প্রথম একতারা হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে সুভদ্রার জন্য। বাহির হইয়াছে অসময়ে, মানুষ যখন ভিখারিকে তাড়াইয়া দেয়। সুভদ্রা তাকে বঞ্চিত করে নাই, নিজেই ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'একটা গান করো তো বৈরাগী ঠাকুর।'

সুভদ্রা তাই তামাশা করিয়া বলিল, 'কেন, ভিক্ষে তো তুমি করতে বৈরিগি ঠাকুর?'

অনেক তামাশাতেই সাধন বৈরাগী পুলকিত হইতে জানে না, এদিক দিয়া মানুষটা সে একটু ভোঁতা।

রোজগারের উপায়টা ঠিক করিল সুভদ্রা। বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে যে হাততিনেক চওড়া বারান্দাটুকু আছে সেখানে দুটি দোকান খোলা হইল, পান-বিড়ি আর তেলেভাজার দোকান। পান-বিড়ির দোকানের ভার রহিল সাধনের, তেলেভাজার দোকানের ভার রহিল সুভদ্রার। বাড়িওয়ালা এবং বাড়ীর আরও তিন ঘর ভাড়াটের কাছে চাওয়ামাত্র অনুমতি পাওয়া গেল।

দোকান খোলার আগের দিন সুভদ্রা বলিল, 'সবাইকে বলে এসো, আজ সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণলীলা গান গেয়ে শোনাব। দোকান যে খুলছি জানানো তো চাই সবাইকে?'

আসর করা হইয়াছিল উঠানে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে মানুষ আর আঁটে না। কৃষ্ণলীলার অনেক গান সুভদ্রা জানিত, একাই সে তিন ঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিল। অনেকদিন এসব গান সে গায় নাই, একটু ভয় তার ছিল গানগুলি ঠিকভাবে গাহিতে পারিবে কি না। কিন্তু আরম্ভ করামাত্র আগের মতোই গানের মোহ কখন যে তাকে মাতাল করিয়া পৃথিবী ভুলাইয়া দিল। এ-বাড়ীর একজন ভাড়াটে গিরীন সাউ চমৎকার বেহালা বাজায়, হারমোনিয়াম আর তবলা বাজানোর লোকও সে-ই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, শুধু বসিয়া থাকিয়াই গানগুলি গাহিয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম গানের অর্ধেকটাও বসিয়া বসিয়া গাওয়া চলিল না। রাধার কাছে যাওয়ার সময় পথে চন্দ্রাবলী তাকে ধরিয়া নিজের কুঞ্জে টানিয়া আনিয়াছে, রাধার জন্য মন আকুল হইয়া আছে কিন্তু বাহিরে সে চতুরালি করিতেছে চন্দ্রাবলীর সঙ্গে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রতঙ্গের সাহায্য ছাড়া এ কি প্রকাশ করা যায়? একটি হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পায়ে না ধরিলে কি খণ্ডিতা রাধার কাছে নিবেদন করা যায়, হৃদয়ে যার শুধু রাধার চিহ্ন আঁকা, বাহিরের অঙ্গে তুচ্ছ নখচিহ্ন দেখিয়া তার

উপর রাগ করা রাধার উচিত নয়? গানের শেষে সুভদ্রা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সাধন ঘরে গেল অনেক পরে। খোলা দরজার বাহিরে তখনও মানুষকে চলাফেরা করিতে দেখা যাইতেছে, কলরব শোনা যাইতেছে। সাধন ঘরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তার সামনে এক হাঁটু মাটিতে নামাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া দু-হাতে তার পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যি বলছি আমি, তুমি ছাড়া আমি কাউকে জানি না। কোনোদিন কোনো পর-পুরুষের দিকে আমি তাকাই নি—'

সাধন তার গালে টোকা দিয়া বলিল, 'সত্যি?'

সুভদ্রা কাতর হইয়া বলিল, 'কেন সন্দেহ করছ? রসিককে যে মাঝে মাঝে আসতে দিতাম তাও তো তোমার জন্যেই? মাইরি বলছি, যখন আর সইতে পারতাম না, মনে হতো আর একটু'খন তোমায় না পেলে বুক ফেটে যাবে, শুধু তখন একটু সময়ের জন্যে—'

বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'উঃ, মাগো! আমি আর বাঁচব না।'

বেহালাবাদক গিরীন সাউ-এর বৌ কালিদাসী আসিয়া বলিল, 'খাবে না বষ্টুম দিদি? কি গানটাই গাইলে বষ্টুম দিদি!'

সুভদ্রা উঠিয়া খাইতে গেল এবং পেট ভরিয়াই খাইল। সেরাত্রে সাধনকে সে আর কাছে ঘেঁষিতে দিল না। কালিদাসী যে সম্মান করিয়া তাকে আজ প্রথম বষ্টুম দিদি বলিয়া ডাকিয়াছে তাতে তার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

পরদিন সকালে এত খদ্দের আসিয়া জুটিল যে সাধনের দোকানের অল্প বিড়ি-সিগারেট ফুরাইয়া গেল আধঘণ্টার মধ্যে, বেগুনি-ফুলুরি ভাজিয়া সুভদ্রা অর্ধেক লোকের দাবি মিটাইয়া উঠিতে পারিল না। সকলেই সুভদ্রার গানের প্রশংসা করিতে চায়, বলিতে চায় যে বেগুনি-ফুলুরির এমন স্বাদ তো জীবনে তারা

পায় নাই। সংকীর্ণ বারান্দায় উবু হইয়া বসিয়া আর বারান্দার সামনে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া সকলে যেন একটি বৈঠক বসাইয়া দিল। লোচন কামার প্রতিমা গড়িতে ওস্তাদ, একটিমাত্র বেগুনি খাইয়া যেন নেশা হইয়াছে এমনিভাবে সে আধঘণ্টা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল সুভদ্রার বুকের দিকে, আর ভাবিতে লাগিল, একটিবার মুহূর্তের জন্য কাপড়ের নিচে সুভদ্রার স্তন দুটি দেখিতে পাইলেই সে ঠিক বুঝিতে পারিত তার প্রতিমার বুকের মাটির ঢিপিগুলির চেয়ে ও-দুটি নিটোল বর্তুলাকার কি না। সতীশ গোয়ালা ভাবিতে লাগিল, ইনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবতী। বংশী হালদার সারাদিন মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সুভদ্রার গেরুয়া বেশ যেন রোদে ঝলসানো শহরের সুরকির পথের মতো চোখে তা ধাঁধা লাগাইয়া দিতে লাগিল। নটবর একজন বড়লোকের খাতিরের খানসামা, সে ভাবিতে লাগিল, সুভদ্রার সঙ্গে একবার যদি ঘনিষ্ঠতা করাইয়া দেওয়া যায়, কি খুশিই বাবু হইবেন। এই চারজন ছাড়া সকলেই কম-বেশি কথা বলিতেছিল, দু-একজন কথা বলিবার চেষ্টায় গিলিতেছিল ঢোঁক।

'এবার আমি রাঁধতে যাই?' বলিয়া একসময় সুভদ্রা ভিতরে চলিয়া গেল। আবার দোকান খুলিল একেবারে সেই বিকালে। একবেলাতেই দোকানদারিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। লোক গুলি বড় ভোঁতা, বড় নীরস। বেগুনি ফুলুরি কিনিতে আসিয়া তাকে যেন সকলেই বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তার সাহচর্যে ভুলিয়া যাইতে চায় নিজেদের।

বিকালেও খদ্দের আসিল অনেকএবং দিন-দিন খদ্দেরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বেগুনি ফুলুরি ভাজিবার জন্য একজন লোক রাখিয়া দেওয়া হইল। সুভদ্রা মাঝে মাঝে আসিয়া পাঁচ-দশ মিনিট বারান্দায় বসিতে লাগিল আর নিজের হাতে বিক্রি করিতে লাগিল ভাজা জিনিসগুলি। বৈঠক তাই ভাঙিয়া গেল কিন্তু

সেজন্য বিক্রি করিল না। বেগুনি ফুলুরিও কম মুখরোচক জিনিস নয়।

বৈঠক না বসুক, লোচন, সতীশ, বংশী আর নটবর নিয়মিতভাবে আসে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে। সুভদ্রা না থাকিলে গল্প করে সাধনের সঙ্গে, সুভদ্রা আসিলে দু-এক পয়সার বেগুনি কেনে আর দু-একটি কথা কয়।

নটবর একদিন তাকে বাবুদের বাড়ি গান গাহিবার বায়না দিয়া গেল। শুনিয়া লোচন বলিল, 'না, না, অমন কম্মোও কোরো না। ওর বাবু বড় খারাপ লোক।'

সতীশ এবং বংশীও সায় দিয়া বলিল, 'যেও না, বিপদ হবে।'

সুভদ্রা বলিল, 'বিপদ হবে? কিসের বিপদ?' তারপর হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, তোমরা তবে দশটা টাকা দাও আমায়, যাব না। তোমাদেরই না হয় গান শুনিয়ে দেব।'

পরদিন সত্যই তারা দশটা করিয়া টাকা নিয়া হাজির। দশটা করিয়া টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে এমনিই সহজ নয়, প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ থাকিলে সেটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিয়া সুভদ্রা খুশি হইল বটে, মন কিন্তু তার ভিজিল না। এসব ফাঁকি সে জানে। সাতদিন একত্র বসবাস করিবার পর সে একটি টাকা বাজে খরচ করিলে এরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করিবে। তাছাড়া, এবালা টাকাটা নিলে ওবেলা এরা একা পাওয়ামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিবে। তার চেয়ে নটবরের বাবুর বাড়ি গান গাহিতে যাওয়া অনেক ভালো।

গান কিন্তু সেখানে জমিল না,—সুভদ্রার গান। আসরে ঝালরবসানো তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপস্থিত ছিল শুধু বাবুর কয়েকটি বন্ধু এবং তবলচি ও সারেঙ্গীর কাছে সহজ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসিয়াছিল আরেকজন মানুষ। তার চোখে কাজল আর ছোট নুরটি লালচে রঙে রাঙানো। ধৈর্যের প্রতীকের মতো সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল আর বাঁ হাতের আঙু-

লের সন্তর্পণ স্পর্শ ধীরে ধীরে বিলাইয়া দিতেছিল নূরে। সুভদ্রা প্রথম গানটি আরম্ভ করার পরেই বাবু আর তার বন্ধুদের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল কিন্তু এ-লোকটি চোখের একটি বাড়তি পলকও ফেলিল না। সুভদ্রা তিনটি গান গাহিবার পর বাবু বলিল, 'এবার তুমি বিশ্রাম করো। ওস্তাদজি, আপনি এবার মেহেরবানি করুন তবে?'

ওস্তাদ এবার একটু হাসিয়া মাথাটি সামনের দিকে সামান্য নিচু করিল।—'সোজা সুরের একটা বাংলা গান গাই?'

'বলেন কি ওস্তাদজি, আপনি বাংলা গানজানেন?' সিগারেটের ধোঁয়া না ছাড়িয়াই সবিস্ময়ে কথাটা বলিয়া বাবুর এক বন্ধু কাশিতে লাগিল।

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'জল খান, দ-ঢোঁক জল খেলেই সেরে যাবে।'

বন্ধুর কাশি থামিলে ওস্তাদ বলিল, 'জানি কি না সে তো মালুম হবে শুনলে?'

ঠুংরিতে হাফেজের বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ। শুনিতে শুনিতে সুভদ্রার মনে হয়, ওস্তাদের অমন সুন্দর ফুলকাটা পাঞ্জাবির তিন-চার জায়গা ছেঁড়া কেন? আরও শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে পাতলা পাঞ্জাবি, ছুঁচ-সূতায় সে কি ছেঁড়াগুলি রিপু করিয়া দিতে পারিবে? গান শেষ হইলে তার মনে পড়ে, রিপুর কাজ সে জানে না, যাত্রার দলে যে-ছেলেটি তার রাধা সাজিত সেই যেন কোথা হইতে খুব ভালো রিপুর কাজ শিখিয়াছিল।

ওস্তাদ সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল?'

সুভদ্রা নির্বিবাদে বলিল, 'আরেকটা শুনি?'

ওস্তাদের কয়েকটি গান শুনিয়া সকাল-সকাল সুভদ্রা বাড়ি ফিরিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তার গানও বাবুর পছন্দ হয় নাই, তাকেও পছন্দ হয় নাই।

পরদিন ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়া ওস্তাদ সুভদ্রার বাড়ি আসিল।

জিজ্ঞাসা করিল, সুভদ্রা গান শিখিবে কি, গান? ভালো ভালো গান? সেই ফুলকাটা জামা পায়জামা পরিয়াই ওস্তাদ আজ আসিয়াছে, মাথায় শুধু আজ একটি জরি বসানো টুপি, আর চোখের কাজল আরও একটু স্পষ্ট। সুর্মা নয়, কাজল। কালিদাসীর ছেলের কাজলপরা চোখের মতোই আশ্চর্যরকম কচি-কচি দেখাইতেছে ওস্তাদের চোখ।

দেখিয়াই সাধন একটা কুৎসিতপ্রশ্ন করিল, নটবরের বাবু বুঝি গান শিখাইতে পাঠাইয়াছে ওস্তাদকে?'

ওস্তাদ বলিল, তোবা 'তোবা, নটবরের বাবু আমার কে?'

জগতে এমন বড়লোক কে আছে যে ওস্তাদকে মনিবের মতো হুকুম দিবে? বাবু তো শুধু তার সাকরেদ, ওস্তাদের বাড়িতে যে দু-চারজন গান শিখিতে আসে তাদের সঙ্গে বাবুর তফাত এই যে, বাবু গাড়ি পাঠায় আর ওস্তাদ তার বাড়ি গিয়া গান শিখায়।

তার পর প্রতি সন্ধ্যায় সুভদ্রা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে লাগিল। কালিদাসী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'মোছলমানের কাছে গান শিখছ বোষ্টুম দিদি?'

সুভদ্রা বলিল, 'মোছলমানই ভালো।'

কিন্তু গান শিখিতে ভালো লাগে না সুভদ্রার, কিছুই ভালো লাগে না। দোকানে নিয়মিত কেনা বেচা চলিতেছে, ভিতরে নিয়মিত ঘর-কন্না চলিয়াছে, নিজেই সে নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করিতেছে নিয়মের ফাঁকি আর বন্ধন। যা-খুশি সে করিতে পারে, কিন্তু যা-খুশি করিবে কি? কি আছে যা-খুশি করার? পথে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিবে? শহরের পাশে যে নদী আছে, তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না, বিষ খাইবে?

সাধনকে সে মিনতি করিয়া বলে, 'এখান থেকে পালাই চলো, এ্যাঁ? তেমনিভাবে ঘুরে ঘুরে দু-জনে, কি মজাটাই হবে!'

সাধন বলে, 'দূর পাগলি! ঘুরে বেড়ানোতে আবার মজা কি?'

তা ঠিক, ঘুরিয়া বেড়ানোতে হয়তো মজা লাগিবে না। সুভদ্রা এখন টের পাইয়াছে, সাধন বৈরাগীর সঙ্গে কদিন পথে পথে কাটানোর আসল মজাটা কি ছিল। কি সুখ ছিল সে ঘুরিয়া বেড়ানোর? কিছুই না। শুধু একটা উত্তেজনা ছিল, প্রতি মুহূর্তের উত্তেজনা, পরমুহূর্তে বুঝি কিছু ঘটিবে, জীবনে কিছু আবির্ভাব ঘটিবে কোনো কিছুর। ক্ষণে ক্ষণে তখন সব বদলাইয়া যাইত, মাটির পথের পর আসিত সুরকির পথ, হাট-বাজারের পরে আসিত মাঠ, তাড়িখানার পরে আসিত দেবমন্দির, একজনের কুৎসিত মন্তব্যের পর আসিত আরেকজনের সভক্তি প্রণাম, মুচির ঘরের আশ্রয়ের পর আসিত বড়লোকের বাগানবাড়ির আশ্রয়। এই পরিবর্তন যেন প্রমাণের মতোই আশা জাগাইয়া রাখিত এ-সমস্তের অতিরিক্ত আরও একটা নতুনত্ব নিশ্চয় আসিবে। সুভদ্রা কৃতার্থ হইয়া যাইবে। আর তার মন ছটফট করিবে না, উল্লাসে গদগদ হইয়া সেই নতুনত্বকে বরণ করিয়া বলিবে, এতদিন আসনি যে বড়, আচ্ছা খামখেয়ালী নিষ্ঠুর মানুষ তো তুমি?

মানুষ? সে-নতুনত্ব কি তবে মানুষ সুভদ্রার? ফাঁপরে পড়িয়া সুভদ্রা এদিক-ওদিক তাকায়। কত মানুষ চলিতেছে পথ দিয়া, সকলেই একরকম, দেহকাণ্ডের সঙ্গে দুটি হাত আর পা আঁটা, এবং উপরে একটা মাথা বসানো। কোনো নতুনত্ব তো নাই এদের মধ্যে। এদের মধ্যে যাকেই সে বরণ করুক, মুখে হাত চাপা দিয়া সে শুধু তাকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যা চায়, কি চায় তা অবশ্য সে জানে না, কিন্তু যা সে চায়, মানুষের মূর্তি ধরিয়া আসিলে তো তার চলিবে না।

সুভদ্রার মনে তাই সন্দেহ জাগিয়াছে, সাধনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর ভালো লাগিবে কি না। জ্ঞান বাড়িয়াছে, প্রত্যাশার উত্তেজনাটুকু পর্যন্ত হয়তো এবার জুটিবে না।

কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে যদি নিরুদ্দেশ যাত্রা করে? কাছাকাছি গ্রাম আর শহরে ঘুরিয়া বেড়ানোর বদলে যদি আজ যায় দিল্লীতে

আর কাল যায় বোম্বাইয়ে এবং তার পরদিন যায় দিল্লী-বোম্বাইয়ের মতো সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আরও যেসব জায়গা আছে, যার নামও সে কোনোদিন শোনে নাই?

কদিন পরে তাই গেল সুভদ্রা, তবে দিল্লি বা বোম্বাইয়ে নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অন্য কোনো জায়গাতেও নয়। সুভদ্রার অত পয়সা কই? ওস্তাদ গরিব মানুষ। তাই কদিন এখানে-ওখানে ভাসিয়া বেড়াইয়া দু-জনে কলকাতা শহরে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। তবে ওস্তাদ ভরসা দিয়া বলিল, তাতে কি আসে যায়? যেখানে খুশি যাওয়ার সাধ মনে থাক, যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে যেখানে খুশি যত দিন খুশি কাটিয়া যাক, একদিন তো তারা যাইবেই যাইবে। তার বেশি আর কি চাই মানুষের? যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার আয়োজন তো তুচ্ছ নয়, মনটাই তো যায় মানুষের মাটির পৃথিবীর বুকে এখান হইতে ওখানে! না-ই যদি যাওয়া হয় এখানকার ঘরবাড়ি যানবাহন লোকজন দেখার বদলে ওখানকার ঘরবাড়ি যানবাহন দেখিতে, এখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটার বদলে ওখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটিতে, একটা যাত্রা তো একদিন তাদের শুরু করিতেই হইবে, অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে সব যাত্রার চরম একটা যাত্রা?

তা বটে। সজোরে ওস্তাদকে জড়াইয়া ধরিয়া সুভদ্রা বলে, 'তবে তাই চলো ওস্তাদ, সেখানেই আমরা যাই। তুমি আমার গলাটা টিপে ধরো, আমি তোমার গলাটা টিপে ধরি।'

ওস্তাদ কি বলিতে যায়, বাঁ হাতটি আলগা করিয়া সুভদ্রা তার মুখে চাপা দেয়। দেহের ভারে মুসাফিরখানার ছেঁড়া নোংরা মাদুরের বিছানায় তাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তার বুকের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

নরম কোমল হাতটি মুখ হইতে সরাইয়া স্ফূর্তির সঙ্গে ওস্তাদ বলে, 'বহুৎ আচ্ছা, মেরাজান! কেয়াবাৎ!,

সুভদ্রা আবার তার মুখে হাত চাপা দেয়।

শেষরাত্রে ওস্তাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাদের দু-জনের বড় পুঁটুলিটি খুলিয়া সুভদ্রা তার শাড়ি-শেমিজের একটি ছোট পুঁটুলি করিতেছে।

মুখ ফিরাইয়া ওস্তাদকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুভদ্রা বলিল, 'পালাচ্ছি ওস্তাদ। চুপিচুপি পালাচ্ছিলাম, তুমি জাগলে কেন?'

ওস্তাদ বাজে কথা কিছু বলিল না, ব্যস্ত হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

'সেখানে ফিরে যাবে?'

'দূর! ফিরে গেলে সাধন বৈরাগী রক্ষা রাখবে আমার? যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

ওস্তাদ উৎসুক হইয়া বলিল, 'বেশ তো, চলো না আমিও সাথে যাই? পিছে পিছে যাব, খুশ হলে কাছে ডাকবে, নয়তো ডাকবে না?'

সুভদ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, এবার একা পালাব ওস্তাদ। পুরুষকে সঙ্গে নেব না। পুরুষ জাতটাই বড় খারাপ, কেবল জড়িয়ে ধরে।'

ওস্তাদ মাথাটা সামনে একটু হেলাইয়া সায় দিল, মুখে কিছু বলিল না। বাঁ হাতে সন্তর্পণে নিজের ছোট লালচে নুরটিকে আদর করিতে লাগিল। একাই যাইতেছে বটে, তবে একা সে থাকিবে না, ওস্তাদ তা জানে। পুরুষ মানুষ একা থাকিতে পারে না, ও তো মেয়েমানুষ। একজন কেউ আসিবেই, সুভদ্রা নিজেই যাকে জড়াইয়া ধরিবে, আর ছাড়িবে না। আর সেই একজন যদি কখনো আনমনে জড়াইয়া ধরিতে ভুলিয়া যায়, চোখে সুভদ্রার জল আসিবে, রাগে সে ফোঁসফোঁস করিতে থাকিবে।

সুভদ্রার পুঁটুলি বাঁধা হইলে ওস্তাদ একটি প্রস্তাব করিল। চুপিচুপি যখন পালানো গেল না, বাকি রাতটুকু বসিয়া গল্প করিলে হয় না, ভোরবেলা সুভদ্রা চলিয়া যাইবে? ভোর হইতে বেশি বাকি নাই।

'তুমি জ্বালালে ওস্তাদ।'

সুভদ্রা কাছে আসিয়া বসিল। গল্প তেমন জমিল না। একটিবার তাকে জড়াইয়া ধরার জন্য মনটা ওস্তাদের আঁকুপাঁকু করিতেছিল। টের পাইয়া সুভদ্রাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, কখন ওস্তাদ একটু ভয়ে ভয়ে তার হাত ধরিয়া মৃদু সলজ্জ হাসির সঙ্গে চোখে চোখে চাহিয়া নীরবে জড়াইয়া ধরিবার অনুমতি চাহিবে। বাহিরে ভোর হইয়া আসিল, রাস্তার আলো নিভিয়া গেল, ওস্তাদ কিন্তু কিছুই করিল না।

তখন সুভদ্রা নিজেই বলিল, 'একবারটি জড়াবে না ওস্তাদ? শেষবারের মতো?

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বেশ বুঝা যায়, ধৈর্য আর সংযমের তলে চাপা পড়িয়া ভিতরের উত্তেজনা ওস্তাদকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে, দম-আটকানো উদ্বেগে নিশ্বাস পড়িতেছে ছোট-ছোট। কদিন কাজল পরা হয় নাই, তবু কাজলের একটু আভাস ওস্তাদের চোখে পাওয়া যায়। আশা, হতাশা, ঈর্ষা, উদারতা, রাগ, দুঃখ, অভিমান, ক্ষমা ও ত্যাগের ভাব মিশিয়া তার মুখে প্রলেপের মতো মাখা হইয়া গিয়াছে, আর চোখ দুটি যেন পলকে পলকে বদল করিয়া ওই ভাবগুলি এক-একটি বাছিয়া বাছিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুভদ্রা চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তুমি সত্যি জ্বালালে ওস্তাদ। যাব না নাকি?' একটু ভাবিয়া সে আবার বলিল, না পালাই, তোমার সঙ্গেও আমার বনবে না।'

ওস্তাদের চোখের ঔৎসুক্য নিভিয়া গেল, আটকানো নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের আলো আরেকটু স্পষ্ট হইয়াছে। সুভদ্রা চলিয়া গেল, ওস্তাদ আর একটি কথাও বলিল না। শেষ চেষ্টা কাজে লাগিল না, আর কি বলিবার আছে? এখন আপনা হইতে ফাঁদটি খসিয়া গিয়াছে ভাবিয়া খুশি হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু সে-চেষ্টা করিতে গিয়া ওস্তাদ দেখিল, ফাঁদ খসিয়া গেলেও ফাঁদে পড়া বেকুব প্রাণীর মতোই ছট্‌ফট্ না-করা অসম্ভব।

ভাঙা ঘর

আকাশ-ভাঙা বর্ষার মধ্যে আমাকে পথহারা পথিক হিসাবে কল্পনা করতে হবে। পথ দিয়ে হাঁটছি না মাঠ দিয়ে হাঁটছি, মাঝে মাঝে তাও ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কারণ, জলের নিচে পথ আর মাঠ একাকার হয়ে গিয়েছে। পথটাও অবশ্য ছিল নামেই পথ, মাঠের বুকে পায়ে-পায়ে গড়ে ওঠা একটা রেখা। তবু সে রেখা ধরে চলবার একটা সুবিধা থাকে যে শেষপর্যন্ত লোকালয়ে পেঁছানো যায়, অন্ধের মতো আধ হাত জলে ছপ্‌ছপ্‌ পা ফেলে যেদিকে খুশি চলতে থাকলে ডোবা পুকুরে পড়বার সম্ভাবনা থাকে বেশি এবং শ্মশানে বা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবার সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে কিছু কম।

তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোনো লাভ নেই, সমস্ত রাত বৃষ্টি না ধরলে সমস্ত রাত্রিটাই তার ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়। তাই, আন্দাজে এগিয়ে চলছিলাম। সামনে অথবা পিছনে, তা বলতে পারব না।

এমনিভাবে চলতে চলতে ভাঙা ঘরখানার সন্ধান পেলাম। আকাশ অবশ্য মাঝে মাঝে আলো সরবরাহ করছিল, সেই আলোতে চোখে পড়ল খড় অথবা শণের প্রকাণ্ড একখানা কাঁচা ঘর ভেঙে পড়ে আছে। আশেপাশে আর ঘর না দেখে একটু বিস্ময় আর বিরক্তি বোধ করলাম। এক-ভিটায় এত বড় একখানা ঘর তুলে সাধারণত কেউ বাড়ি করে না, চার-ভিটায় না হোক এবং প্রত্যেক ভিটায় এত বড় না হোক, অন্তত তিন-ভিটায় তিনখানা ঘর তোলা হয়। বিদ্যুৎ চমকাবার প্রতীক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এটা কি তবে গৃহস্থের বাড়ি ছিল, না কোনো বিশেষ প্রয়োজনে কোনো একদিন মাঠের মাঝখানে কেউ একখানা ঘর তুলেছিল,

তারপর প্রয়োজন শেষ হয় যাওয়ায় ঘরখানা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াতেও কেউ খেয়াল করেনি ? কিন্তু তাহলে তো চারিদিকে আগাছার জঙ্গলের মাথা তুলবার কথা।

ভাঙা ঘরের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে যাবার পর এ-সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। বাড়িটা যে-গৃহস্থের, চার-ভিটাতে সে চার-খানা ঘরই তুলেছিল বটে। ভাঙা ঘরের দু-পাশের ভিটায় আরও দুখানা ঘর ভেঙে পড়ে আছে এবং বিপরীত দিকের ভিটায় দাঁড়িয়ে আছে একখানা ঘর। প্রথম ভাঙা ঘরখানার কাত হয়ে পড়া প্রকাণ্ড চালাটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি। এবার সহজেই বুঝতে পারলাম এতক্ষণে বাড়ির ভিতরের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছি, যে-অঙ্গনের অর্ধেকের বেশি দখল করেছে পাশের ভিটার ভাঙা ঘরখানা। একটু দ্বিধা করলাম। তিনখানা ঘর—বড় আর ভালো তিনখানা ঘর—ভাঙা ; দাঁড়িয়ে আছে শুধু টিনের চালের ছোট ঘরখানা, সামনে যার একটু রোয়াক পর্যন্ত নেই। ওখানে আশ্রয়ের খোঁজ করার চেয়ে গাছতলায় নিরাশ্রয় হয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ?

যা কিছু দেখছিলাম, সমস্তই কয়েক মিনিট পরে পরে চোখের পলকে—প্রায় না দেখারই সামিল। তাই বুদ্ধির ওপর বেশি নির্ভর না করে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ ঝাঁপের দরজা ঠেলে গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, 'কে আছেন ? ও মশায় ! শুনছেন ?'

ভয়ার্ত পুরুষ কণ্ঠে সাড়া এল ঃ 'কে ?'

প্রথমে বললাম, 'আমি।' তারপর সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললাম যে পথ-হারানো একজন পথিক—ভদ্রলোক। ঝাঁপে কান লাগিয়ে ভিতরের শব্দ শুনবার চেষ্টা করছিলাম, চাপা মেয়েলি গলার প্রশ্ন শুনতে পেলাম 'খুলবে ? যদি চোর-ডাকাত হয় ?' চাপা পুরুষ গলার জবাব শুনলাম ঃ 'চোর-ডাকাত হলে কি ঝাঁপটা খুলতে পারবে না ?'

একটু পরে ঝাঁপ খুলে গেল, সন্তর্পণে ভিতরের অন্ধকারে

এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিজা জামা-কাপড়ের জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না। ঘরের ভিতরের ভাপ্‌সা গরম আর গন্ধে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আমার মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগে একবার একটা মালগুদামে কয়েক ঘণ্টা আটক পড়েছিলাম, সেই কয়েক ঘণ্টা সময় নিশ্বাস নিতে আমার ঠিক এইরকম কষ্ট হয়েছিল আর ঠিক এইরকম অকথ্য অস্বস্তিব সঙ্গে মনে হয়েছিল আমারই পেটের ভিতরের সিক্ত উষ্ণতা বাইরে এসে চারিদিক থেকে আমার সর্বাঙ্গে মাখা হয়ে যাচ্ছে।

কালিপড়া একটা লণ্ঠন জ্বলবার পর টের পেলাম, ঘরে অনেক-গুলি নানাবয়সী মানুষ বাস করলেও এটাকে মালগুদামও বলা চলে। তবে পৃথিবীর কোনো মালগুদামেই এত রকমের বিভিন্ন আর বিচিত্র মাল থাকে কি না সন্দেহ। ঘরে আর তিল ধারণের স্থান নেই। ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে সেকেলে একটা খাট আর একেলে চৌকি, খাটের ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে একগাদা ছেলেমেয়ে। চৌকিতে গোটা দুই তোরঙ্গ, পিতল ও মাটির হাঁড়ি-কলসি, বস্তা-বাঁধা লেপ, কাপড়-জামার পুঁটুলি এবং সাধারণ গৃহস্থের ঘর-কন্নার অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের অর্ধেকটাতে ছেলেদের স্কুলের ছেঁড়া বই-খাতা, অর্ধেকটাতে শিশি-বোতল, টিনের কৌটা, কাগজের ঠোঙা—ইত্যাদি একদিকের বেড়ার গায়ে কাঠের থামে ঠেসান্‌ দেওয়া একটা পুরানো ভাঙা সাইকেল। গোটা-চারেক রঙচটা লোহার আর গোটা-দুই বেতছেঁড়া কাঠের চেয়ার, একটা পায়া-ভাঙা টুল আর সাত-আটটি ছোট-বড় কাঠের পিঁড়ি প্রভৃতি বসবার সরঞ্জামেরও অভাব নেই। একখণ্ড তক্তার উপরে বোধ হয় তিনটি চালের বস্তা, কাছেই তরকারির ঝুড়ি। চৌকির তলে অসংখ্য আবছা জিনিস-পত্রের একপাশে মস্ত একটা বঁটির ফলা চকচক করছে। খাটের তলাটাও জিনিসে ঠাসা, কিন্তু সেখানে বোধহয় নিজেকে ঘোষণা

করতে পারে এরকম ঝকঝকে কিছু নেই। এক কোণে পুরানো ভাঙা জিনিসপত্রের স্তূপ—আবর্জনার সামিল। অন্য কোণে বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক, ছোটখাটো একটা চৌকির সমান। সিন্দুকের উপরে বিছানা পাতা, বিছানায় বসে আছে বছর—পঞ্চাশেক বয়সের শীর্ণ-দেহ একটি লোক। দুয়ারের কাছে একটু স্থান ছাড়া মেঝে আর চোখে পড়ে না, যে জায়গাটুকুতে জিনিস নেই সেখানে বিছানা পাতা হয়েছে। কেবল মেঝেতে নয়, টিনের চাল থেকে দড়ি বেঁধে যত কিছু ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব তাও রাখা হয়েছে। ঘরের সমস্ত জিনিসের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে মস্ত এক সম্পন্ন গৃহস্থের শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর রান্নাঘরে যত জিনিস থাকে তার প্রত্যেকটির নাম করতে হয়।

মাথার উপরেও যে জিনিস ঝুলছে এটা আমাকে আবিষ্কার করতে হলো বাধ্য হয়ে। মেঝের বিছানাতেও চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তাদের মধ্যে একটি মেয়ের বয়স পনের-ষোলর কম হবে না। ছোট ছোট ভাইবোনদের মতো পরনের শাড়ীখানাকে সেও একেবারে ত্যাগ করেছে। নজরে পড়ামাত্র চোখ তুলে মাথার উপরে ঝুলানো একটা বেতের ঝাঁপির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বেতের ঝাঁপি তো ঝুলানো থাকেই না, এই বয়সের মেয়ে দম—আটকানো গরমেও ঘুমের মধ্যে অঙ্গের আবরণ ঘুচিয়ে দেয় না।

সাত-আট মাসের একটি শিশুকে কাঁখে নিয়ে যে-মহিলাটি কালিপড়া লন্ঠন জ্বালিয়েছিল, দরজার ঝাঁপও বোধহয় খুলেছিল সে-ই, কারণ সিন্দুকের উপরের বিছানা ছেড়ে লোকটি যে নিচে নামেনি বুঝতে কষ্ট হয় না। এতক্ষণ উবু হয়ে বসে সে বোধহয় আমাকেই দেখছিল, এবার মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'দেখেছ ? হারামজাদি মেয়ের কাণ্ডখানা দেখেছ ?'

মহিলাটি মেঝের পাতা বিছানার কাছে এগিয়ে গেল নীরবেই কিন্তু মেয়েটির গালে একটা চড় বসিয়ে দিল সশব্দে। চড়ের শব্দ

না শুনলে আমি হয়তো ঝাঁপি থেকে চোখ নামাতাম না। আর্তনাদ করে জেগে উঠে মেয়েটি কাঁদবার উপক্রম করছিল, মহিলাটির উদ্যত চড় দেখে কান্না বন্ধ করে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় ঘুম তার তখনও ভাঙেনি, আরও বোঝা যায় যে মস্তিকের যে-অঞ্চলটিতে জীবনের সাড়া ওঠে সেখানটা তার খুঁত-ধরা। মহিলাটি পায়ের তলা থেকে শাড়িখানা কুড়িয়ে এনে তাকে ঢেকে দিতে গেল কিন্তু ততক্ষণ সচেতন হয়ে ওঠায় নিজেই সে কাপড়টিকে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের পলকে নিজেকে ঢেকে ফেলল।

'মরণ হয় না তোর ?'—ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটির তীব্র চাপা ধমক শুনতে পেলাম।

আমি এদিকে ভিজা জামাকাপড়েই দাঁড়িয়ে আছি আর জল ঝরে ঝরে পায়ের তলায় জমা হচ্ছে। এ কোনদেশী আতিথ্য ? আমাকেই কি বলতে হবে, ভিজা কাপড় ছাড়বার জন্য আমাকে একখানা কাপড় দেওয়া দরকার ?

'এই বিষ্টির মধ্যে এতরাত্রে মশায় এদিকে—?' সিন্দুকের ওপর থেকে প্রশ্ন এল।

আমি বললাম, 'আপনাদের এখানে তো জায়গা হওয়া মুশকিল আশেপাশে কারও বাড়ি আছে বলতে পারেন ?'

'আছে বৈকি, আমবাগানটার ওপাশে ঢের বাড়ি আছে।'

আটহাতি কিন্তু পরিষ্কার একখানা কাপড় আমার দিকে এগিয়ে ধরে ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটি বলল, 'কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন। আপনি বাড়ি খুঁজে পাবেন না।'

সিন্দুকের ওপর থেকে সায় এল, 'তা বটে, বাড়ি এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত বটে। কি বাদলাটাই নেমেছে, বাপ্ !'

জামাকাপড় ছেড়ে দিতে মহিলাটি সেগুলি চিপে মেলে দিল,—মেলবার স্থান যে ঘরে পাওয়া গেল তাই আশ্চর্য। আমি সিন্দুকে লোকটির পাশে উঠে বসলাম। মহিলাটি খাটে উঠে আমার দিকে

পিছন ফিরে বসল, বোধহয় কোলের শিশুটিকে মাই দিতে।

'খান বিড়ি খান—'

বালিশের তলা হাতড়িয়ে বিড়ি আর দেশলাই বার করে লোকটি আমার হাতে দিল। বিড়ি টানতে গেলেই আমার কাশি আসে, সিগারেট কেসে সিগারেটগুলিও সম্ভবত ভিজে যায়নি, তবু আমি বিড়িই ধরালাম। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির মধ্যে লোকটির মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা কঠিন কিন্তু এখন যে গাম্ভীর্য নেমে আসতে দেখলাম গোঁফদাড়ির জঙ্গলেও বোধহয় তা আড়াল হয় না।

'বাড়ির কথা জিগ্যেস করলেন তাই বললাম বাগানের ওপাশে বাড়ি আছে। আপনি যেতে চাইলেও কি আপনাকে যেতে দিতাম মশাই! আজ পর্যন্ত এ বাড়ি থেকে একজন অতিথি ফিরে যায় নি।'

ব্যাখ্যা, কৈফিয়ত এবং আত্মসমর্থন। বিড়িতে টান দিয়ে আমি কয়েকবার কাশলাম।

'ঘর তিনটে না হয় পড়েই গিয়েছে, তাই বলে জল-ঝড়ের মধ্যে বাড়িতে লোক এলে তাড়িয়ে দেব! একটা ঘর তো আছে!'

আমিও একটু কৈফিয়ত দিয়ে বললাম, 'আহা, তাড়িয়ে দেবেন কেন—ঘরে তো আপনি ঢুকতেই দিয়েছিলেন। তবে, এইটুকু ঘরে আপনাদেরই শোবার জায়গা নেই।'

লোকটি সংক্ষেপে বলল, 'আপনি ওই খাটে শোবেন। ওদের সরিয়ে এখুনি বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

ক'মাইল পথ হেঁটেছি ঠিক নেই, পা আমার টনটন করছিল, গা আমার ব্যথা করছিল, চোখ আমার জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। তবু এ-প্রস্তাবটিতে সায় দিতে পারলাম না। খাটে যতগুলি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে, ঘরকন্নার জিনিসের মতো তাদের গাদা করে রাখবার উপযুক্ত একটু স্থানও ঘরের কোথাও চোখে পড়ল না। বললাম, 'না, আমি শোব না। আপনারা শোন্, আমি এই সিন্দুকের ওপরে ওইখানটাতে ঠেস্ দিয়ে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'তা কি হয় মশায়! আপনি থাকবেন বসে আর আমরা দিব্যি শুয়ে নাক ডাকাব! নরকেও তো আমাদের ঠাঁই হবে না!

'কিন্তু খোকাখুকিরা যাবে কোথায়?'

'আহা, ওদের একটা ব্যবস্থা হবে বৈকি। তোমরা যে বসেই রইলে চুপচাপ? ভদ্রলোককে কিছু খেতে দাও, বিছানাটা ঠিক করে দাও?'

বড় মেয়েটি মুখের কাছে হাঁটু তুলে দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল আর থেকে থেকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। আমার মতো শ্রান্ত-ক্লান্ত ঘুমকাতুরে মানুষের দৃষ্টিকেও পীড়ন করে মুখে তার এমন গভীর ক্লিষ্টতার ছাপ। খাটের ওপর থেকে মহিলাটি তাকে ডেকে বলল, 'ছোট একটা থালায় লাড়ু আর নারকেলের সন্দেশ দে—দুটো আম কেটে দে!,

আমি হাত জোড় করে লোকটিকে বললাম, 'দোহাই আপনার, এত রাতে আর খেতে বলবেন না, মরে যাব। আশ্রয় যে পেয়েছি তাই ঢের—'

লোকটি ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'কিছই খাবেন না, সামান্য কিছু?'

ঘোমটার ভেতর থেকে উৎসুক কণ্ঠে শব্দ এল, 'সব ঘরেই আছে, হাঙ্গামার কথা মনে করে যেন—'

যে-চোখে দশ মিনিট আগে তাকে উলঙ্গ দেখেছিলাম আমার সেই চোখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'দিই না?'

আমি ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলাম, এ-বাড়িতে আমিই প্রথম অসময়ের অতিথি নই, হয়তো এই ছোট ঘরখানাতে এরকম অবস্থাতেও আরও অতিথি বাস করে গিয়েছে। কর্তা, গিন্নী বা মেয়ে কারও কাছে আমি অনভ্যস্ত বিপজ্জনক আবির্ভাব নই। আমার খাওয়া এবং শোবার ব্যবস্থা করার ভাবনায় তলে বলে এদের পাগল হওয়ার উপক্রম হয়নি—এঁদের পরিচর্যার ভূমিকাটুকুই আমাকে যা

করে ফেলার উপক্রম করছে।

মুখ গম্ভীর করে বললাম, 'পেটের অবস্থাটা ভালো নয়, কিছু খেলে সইবে না।'

তখন কর্তা আর গিন্নি প্রায় একসঙ্গেই সায় দিয়ে বলল, 'তবে থাক্।'

কিন্তু ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে কয়েকটিকে টানাহেঁচড়া করার ব্যবস্থাটা যে কি করে রদ করা যাবে ভেবে পেলাম না। অতবড় একটা খাট দখল করে আমি একা শুয়ে থাকব আর ওরা কেউ শোবার জায়গা পাবে না! ওদের সঙ্গেই খাটে শোয়া চলে কি না একবার বিবেচনা করে দেখলাম, কিন্তু সেটাও সম্ভব মনে হলো না। কাঠের সিন্দুকের উপরে বসে খাটের জোরালো গন্ধটা অনুভব করছিলাম, ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নতুন চাদর বিছিয়ে দিলেও গন্ধটা অন্তর্ধান করবে বলে ভরসা হল না।

ভেবেচিন্তে বললাম, 'এক কাজ করা যাক আসুন। আপনি খাটে খোকাখুকিদের কাছে শোবেন যান, আমি এখানে শুয়ে থাকি।'

আপনি কি এখানে শুতে পারবেন মশায়! পা বেরিয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'একটু পা বেরিয়ে থাকলে কিছু আসবে যাবে না।'

লোকটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'তাছাড়া সে বড় হাঙ্গামা।'

অতগুলি ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে তুলে খাট খালি করার চেয়ে এ-ব্যবস্থার হাঙ্গামা বেশি হওয়া কি করে সম্ভব কোনোমতেই ভেবে পেলাম না। লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল, 'কি জানেন' আমাকে তাহলে আপনার ধরাধরি করে খাটে নিয়ে যেতে হবে, উনি একা পারবেন না।'

কাপড় তুলে ধরতে দেখলাম হাঁটুর নিচে থেকে দুটি পা-ই ভদ্রলোকের কাটা।

'সিন্দুকের ওপরে শুতে আমার অসুবিধে নেই, পা বেরিয়ে যায় না। আপনি অবিশ্যি এতক্ষণ ভাবছিলেন, বাড়িতে অতিথি এল আর এ-ব্যাটা দিব্যি আরাম করে সিন্দুকের ওপর গাঁট হয়ে বসে আছে। কি করব মশায়, নামবার ক্ষমতা থাকলে তো নামব।'

আমি বললাম, 'আহা আপনার তো বড় কষ্ট। ঘর চাপা পড়ে পা ভেঙে ছিল বুঝি?'

আজ্ঞে না, ট্রেনে কাটা গেছে, দশ—বার বছর আগে। ঘর তো আমার ভেঙে পড়েছে গত বছর—সেই যে ভীষণ ঝড় হয়েছিল সাতই আশ্বিন?—সেই ঝড়ে। বড় ঘর তিনখানাই পড়ে গেল, খাড়া রইল শুধু এই ছোট ঘরখানা।'

ঝড়ে বড় ঘরই পড়ে। বড়র পতনের এই বিধানটা চিরদিন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মহিলাটির সাহায্যে লোকটিকে খাটে চালান করে দিয়ে আমি সিন্দুকের ওপর পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম—বেড়ার দিকে মুখ করে। ঘোমটাটানা মহিলা এবং তার বড় মেয়েটিও তো শোবে। আলোটা জ্বলতে লাগল, সম্ভবত ঘরে অজানা অচেনা মানুষ থাকার জন্য।

শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের উচিত হয়েছে? আশ্রয় না দেওয়ার অধিকার তো এদের ছিলই, কেবল তাই নয়, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের অন্যায় হয় নি?

অন্ধ ও ধাঁধা

নিদ্রাপুরীর সদর গেটটা প্রত্যহ ঝনঝন শব্দ করিয়া খুলিয়া যায়। ভোরে ঘুম ভাঙিলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে বলিয়াই যেন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ রাস্তায় জল দিবার গাড়িতে প্রচুর শব্দের ব্যবস্থা রাখিয়াছে।

সমস্ত বিছানা হাতড়াইয়া বালিশের পাশে চশমার খোঁজ মিলিল। কাল ঘুমের চোখে খাপে ভরিয়া রাখিতে মনে ছিল না, রাত্রে কখন মাথার চাপে চ্যাপটা হইয়া গিয়াছে। টিপিয়া টিপিয়া ডাঁটগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া চশমা নাকে লাগাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। মন্দ হয় নাই। অস্বাভাবিক চাকচিক্যে ভোরের আলো একেবারে অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া হেরম্ব পথের উপরে খোলা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। ধুলা ভিজাবার সমারোহ সমাপ্ত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি বিদায় নিয়াছে। পথের ওদিকে ছোট গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া আছে একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি।

গলির ভিতরে বোসদের একতলা বাড়িটি খালি পড়িয়াছিল, কোনো অজ পাড়াগাঁ হইতে তাহার ভাড়াটে আসিল বোধ হয়। গাড়ির ছাদে যে জিনিসগুলি হেরম্বের চোখে পড়িল, গ্রাম্য গৃহস্থের সংসার ছাড়া কুত্রাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রঙ-চটা টিনের তোরঙ্গ, বাক্সহীন সিঙ্গল-রীড হারমোনিয়াম ও ময়লা কাপড়ের বোঁচকা হইতে আরম্ভ করিয়া চালের বস্তা, ডালের হাঁড়ি, মশলা রাখা টিন, ঝুড়িভরা কড়াই খুন্তি হাতা প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, এক-পোঁটলা অর্ধশুষ্ক পুঁইশাক এমনকি গোবরমাখা গোরু-বাঁধা দড়ি পর্যন্ত গাড়ির ছাদে স্থান পাইয়াছে।

ক্ষুদ্র এক টুকরি কয়লাও ইহারা মমতাবশে ফেলিয়া আসে নাই।

ঘুম ভাঙিয়া চোখের সামনে এ যেন পরম উপভোগ্য দ্রষ্টব্যের আবির্ভাব। সকালবেলার আলস্য এ-হেন উপলক্ষ পাইয়া সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। মন্থর চিন্তাযুক্ত মন দিয়ে স্তিমিত নেত্রে হেরম্ব আরোহীর অবতরণ দেখিতে লাগিল।

প্রথমে নামিল একটি দৈত্য। গায়ের রঙ নিকষ কালো, মাথার চুল ধবধবে সাদা। বয়স বড় কম হয় নাই, কিন্তু যে গ্রামে ইহার বাস তার আশেপাশে ডাকাতি হইলে এখন পর্যন্ত পুলিশ সর্বপ্রথমে ইহাকে ধরিয়া নিঃসন্দেহ টানাটানি করে। গায়ের বিবর্ণ খাকী শার্টটা শরীরের চাপে ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে, পরনে ছয়-হাত মলিন ধুতি, নিজেও সে পাঁচ হাতের কম লম্বা নয়, পায়ে ধূলি মলিন চটি।

তুচ্ছ মানুষ, দেহের মানুষ। শক্তি যতই থাক, কুরূপের সীমা নাই, হেরম্বের দু-চোখে ঈর্ষা ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। এক হাতে গাড়ির দরজা চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হাতে শাড়ির প্রান্ত উঁচু করিয়া (হাঁটুর কাছে একটি লম্বা ক্ষতের দাগ হেরম্বের চোখে পড়িল ; বহুদিন পরে মেয়েটির কথা ভাবিতে গেলে এই চিহ্নটি সর্বপ্রথমে তাঁহার স্মরণে আসিত) এবার যে সন্তর্পণে অবতরণ করিল তাহাকে দেখিলে চোখের পলক বন্ধ হইয়া যায়।

দৈত্যের পিছনে এ যেন এক অপহৃতা রাজকন্যার আবির্ভাব।

আধ-হাত ঘোমটায় মুখঢাকা, পাছাপাড় কোরা শাড়িপরা দৈত্যবধূর পরিবর্তে ইহাকে নামিতে দেখিয়া হেরম্বের চুরুট টানা বন্ধ হইয়া গেল। দৈত্যকে গাড়ির ছাদের জিনিসগুলির কর্তা বলিয়া অনায়াসে ভাবা যায়, কিন্তু এই মেয়েটির ভর্তা বলিয়া কল্পনা করা চলে কেমন করিয়া ? রূপার হাঁসুলিতে হীরার পদকের মতো একান্ত অবিশ্বাস্য !

ভর্তা নিশ্চয়ই নয়,—ভৃত্য। স্বামী গাড়িতে আছে, এইবার নামিবে। হেরম্ব উগ্র কৌতুহলের সহিত প্রতিক্ষা করিতে লাগিল।

নামিল শুষ্ক শীর্ণ এক বৃদ্ধ। ঠিক যে নামিল তাহা নয়, দৈত্য তাহাকে একপ্রকার কোলে করিয়াই নামাইয়া দিল। মেয়েটি তাহার হাত ধরিয়া একপাশে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া জিনিস নামানোর তদ্বিরে ব্যাপৃত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ নড়েনা-চড়েনা, সেইখানে ঠায় দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপায়। হেরম্ব বুঝিতে পারিল সে অন্ধ।

অন্ধ! গতরাত্রের জ্যোৎস্নার চেয়ে বিস্ময়কর আলো চারিদিকে খেলা করিতেছে, হাত বাড়াইলে দু-চোখের একটি জীবন্ত তৃপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারে, তবু বেচারা অন্ধ! হেরম্ব সভয়ে দেখিল, বৃদ্ধের চোখের পাতার তলে চোখ নাই, আছে চামড়া ছাড়ানো তাজা মাংসের রক্তাক্ত বীভৎসতা! অদৃশ্য জগতের শব্দকে অনুসরণ করিয়া দৃষ্টিহীন গহ্বর দুটি এদিক-ওদিক ফিরিতে লাগিল, হেরম্ব অভিভূতের মতো তাকাইয়া রহিল।

পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। জিনিসগুলি নামানো হইলে মেয়েটি কি ভাবিয়া বারান্দার নিচে আগাইয়া আসিল। মধ্যাহ্নের সূর্যমুখীর মতো ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বলিল, একবার নিচে আসবেন?

যাই, এখুনি যাচ্ছি।

একটু সময় লাগিল। জামাটা গায়ে দিতে হয়, চোখের ও মুখের রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লিষ্টতা ধুইয়া ফেলিতে হয়, প্রভা চায়ের জল চাপাইয়াছে, তাহাকে এখনই ফিরিয়া আসার আশ্বাস জানাইতে হয়।

বাহিরে গিয়া হেরম্ব দেখিল মেয়েটি পথ ছাড়িয়া রোয়াকে উঠিয়া আসিয়াছে। দু-পাশে প্রত্যেকটি বাড়ির জানালা খুলিয়া গিয়াছে, কিষণ মুদির দোকানে ক্রেতাদের মুখ এইদিকেই ফেরানো, পথের কয়েকজন পথিকও হঠাৎ চলিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল,

এও দেখছি আমাদের গাঁয়েরই মতন। মানুষ দেখতে মানুষ ভিড় করে।

এতক্ষণ সেও যে ওই কাজই করিতেছিল হেরম্বের তাহা মনে পড়িল না। বলিল, সব ছোটলোক। আপনি বরং ভিতরেই চলে আসুন। আমার স্ত্রী—

মেয়েটি বলিল, আপনার স্ত্রীকে আর বিরক্ত করব না। আপনার কাছেই আমার একটু সাহায্যের প্রার্থনা। আমার ওই চাকরটার শরীর যত বড়, বুদ্ধি তত কম। তাছাড়া বাজার-হাট পথঘাটও চেনে না। আপনার চাকরকে যদি দয়া করে একঘণ্টার জন্য ধার দেন—

সারাদিনের জন্য চাকরকে ধার দিতে স্বীকার করিয়া হেরম্ব বলিল, আপনাদের এবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা আমার এখানে হতে পারে না?

মেয়েটি একটু ভাবিল।—না, রান্না আমিই করে নেব। তোলা উনুন কয়লা সব সঙ্গে আছে, অসুবিধা হবে না।

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, জোর করা আমার পক্ষে অশোভন। আমার স্ত্রীকে ডেকে আনি। সে পীড়াপীড়ি করতে পারবে।

মেয়েটি হাসিল, তা তিনি করবেন না। আমার সঙ্গে যে—বুড়োমানুষটি আছেন ওর জন্যে বিশেষ কায়দা করে রাঁধতে হয়। আমি ভিন্ন সে—কায়দা কারো জানা নেই। কিন্তু আমরা ক্ষুধাতুর হয়ে আছি, মুড়ি চিড়া সুজি যাহোক কিছু জলখাবার আর একটু দুধ যদি পাঠিয়ে দেন—

বৃদ্ধকে নির্দেশ করিয়া হেরম্ব বলিল, উনি কে?

উনি আমার আত্মীয়, অভিভাবক।

হেরম্ব মনে মনে হাসিল। অভিভাবকই বটে! চিরন্তন গাঢ় অন্ধকারে বসিয়া চক্ষুষ্মতীর সম্বন্ধে কি অভিনব ভাবনাই না জানি ও ভাবে?

একঘণ্টার জন্য চাকরকে ধার দিয়া সদ্য-আগতা প্রতিবেশিনীর

প্রতি কর্তব্য শেষ করা গেল না। বাড়িটার সবে সংস্কার হইয়াছিল, চুন সুরকি ভাঙা ইট ও নানাবিধ আবর্জনায় এমনই নোংরা হইয়াছিল যে, পরিষ্কার করতেই দৈত্য ও হেরম্বের চাকরের সারাদিন লাগিয়া যাইত। হেরম্বই দু-জন কুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাড়ি পরিষ্কারের কাজে লাগাইয়া দিল, নিজের বাড়ি হইতে একটা তক্তপোশ আনাইয়া বৃদ্ধের শয়নের বন্দোবস্ত করিল এবং নিজেই কুয়ার ধারে গোটাতিনেক খুঁটি পুঁতিয়া কাপড় দিয়া ঘেরিয়া রাধার স্নানের অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাধা মৃদু হাসিয়া বলিল, গাঁয়ের মেয়ে, পুকুরে স্নান করি, ভিজা কাপড়ে বাড়ি ফিরি। শহরে এসেই মানুষের দৃষ্টিকে অপমান করব ?

এ অবশ্য প্রকারান্তরে কৃতজ্ঞতা জানানো, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল এভাবে ঘুরাইয়া বলিবার আরও একটা অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। রাধার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ওদিকে দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে দৈত্য তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। দু-চোখে তাহার অকথ্য বিতৃষ্ণা।

হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া দৈত্য সরিয়া গেল।

ও ডাকাতটাকে সঙ্গে এনেছেন কেন ?

রাধা হাসিল, আত্মরক্ষার জন্য। অতখানি অনুগত অন্ধ শক্তি আর কোথায় পাব ?

শক্তির অন্ধতা বিপজ্জনক।

অন্যের পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। বিপজ্জনক অন্ধ শক্তি পৃথিবীতে আছে বলেই ওকে সঙ্গে এনেছি। নইলে—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। বারান্দার শেষপ্রান্তে কোণের ঘরখানা অন্ধ বৃদ্ধের, সেদিক হইতে কড়া তামাকের দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল! অকস্মাৎ সে-ঘরে এমন বীভৎস একটানা কাশির শব্দ আরম্ভ হইয়া গেল যে, হেরম্ব চমকাইয়া উঠিল।

ওকি? কে কাশে অমন করে?

রাধা পাংশুমুখে বলিল, আমার সেই অভিভাবক। বলিয়া দ্রুতপদে অন্ধের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হেরম্ব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। ওই শীর্ণকায় মুমূর্ষু বৃদ্ধ এমন ভয়ানক শব্দ করিয়া কাশে!

কাশি যেন আর থামিতে চায় না। একটা প্রকাণ্ড বকযন্ত্রের মধ্যে তোড়ে জল প্রবেশ করিবার চেষ্টায় মুহুর্মুহুঃ থামিয়া থামিয়া গর্জন আরম্ভ করিয়াছে। হেরম্বের মনে হইল আর খানিকক্ষণ এভাবে কাশিলে বৃদ্ধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গলি খসিয়া চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িবে।

খানিক পরে দম আটকানোর মতো একটা বিশ্রী আওয়াজ হইয়া কাশি থামিয়া গেল। রাধা ফিরিয়া আসিলে হেরম্ব বলিল, এ তো দেখছি সাংঘাতিক কাশি?

রাধার ফ্যাকাসে মুখে ধীরে ধীরে রক্ত ফিরিয়া আসিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে ভুগছেন। ভুগে ভুগেই ওঁর এমন চেহারা হয়েছে, নইলে বয়স খুব বেশি নয়। মোটে চল্লিশ।

হেরম্ব অবাক হইয়া বলিল, কাশির অসুখে মাথার চুল সাদা হয়ে যায়?

তাইতো গিয়েছে দেখছি। জানেন, ওর চুলের দিকে তাকালে আমার ভয় করে। এমন হঠাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেল! তিন-চার মাস আগেও সব চুল কালো ছিল। সেই থেকে স্বভাবও বদলে গেছে। কেশে কেশে মরবার দাখিল হয়েছে, তবু তামাক খাওয়া চাই। এমনি পায় না, আজ চাকরের হুঁকো কল্‌কে খুঁজে নিয়ে—

কি করে খুঁজলেন?

তাই ভাবছি। চোখ নষ্ট হবার পর থেকে ওঁর কতগুলি আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মেছে।

উনি আপনার কে হন ?

সে তো আপনাকে বলেছি। আমার আত্মীয়।

কিরকম আত্মীয় ?

পরমাত্মীয়। বলিয়া রাধা হাসিবার চেষ্টা করিল।

এ-বিষয়ে হেরম্ব আর কোনো প্রশ্ন করিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাশির পক্ষে এ জায়গাটা খুব উপকারী। মাসখানেকের মধ্যে ওঁর অনেক উপকার হবে।

সেইজন্যই তো এখানে এলাম। ওঁর বেঁচে থাকা বড় দরকারী, বড় দরকারী। এই বলিয়া রাধা এমন একপ্রকার রহস্যময় দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের পানে চাহিয়া এত বেশি অন্যমনস্ক হইয়া গেল যে হেরম্বের মনে হইল শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নয়, একটা অন্যতম বৃহৎ কারণে অকালবৃদ্ধের বাঁচিয়া থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিয়াও সে এই উদ্যত প্রশ্নটাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না—বেঁচে থাকা দরকারী কেন ?

অতর্কিতে একটি অতিবড় অপরাধ যেন ধরা পড়িয়াছে, এমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া রাধা কেমন বিহ্বল হইয়া গেল।

সে আপনি বুঝবেন, আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি আজ আমায় একটা ভিক্ষা দিন। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। করবেন ?

হেরম্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, করব বৈকি। নিশ্চয় করব।

পরম আশ্বস্ত হইয়া রাধা বলিল, ডাক্তার বলেন দু-এক বছরের মধ্যে ওর কিছু হবে না। আপনার কি মনে হয় ?

আমার মনে হয় উনি সেরে উঠবেন।

না, সে আশা আর নেই। বলিয়া রাধা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। শেমিজ খুলিয়া চুল এলাইয়া দিয়া গামছা হাতে রাধা বাহির হইয়া আসিলে হেরম্ব বিদায় চাহিল।

রাধা বলিল, বিকালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন।

হেরম্ব হাসিল, কার ছেলেমেয়ে? আমার? কোথায় পাব!

ছেলেমেয়ে নেই আপনার!

এ যেন অকথ্য, অবিশ্বাস্য, কল্পনাতীত দুঃসংবাদ! হেরম্বর মনে হইল ইচ্ছা করিয়াই গামছাটা ফেলিয়া দিয়া কুড়াইবার ছলে রাধা কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখখানা আড়াল করিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল, ওইটুকু সময়ের মধ্যে মুখের হতাশা-ব্যঞ্জক ভাবটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া দিতে পারে নাই। একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আপনাকে দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল আপনার ঘরভরা ছেলেমেয়ে। এমন স্বাস্থ্য এমন রূপ এমন প্রতিভার জ্যোতি মুখেচোখে—

রাধা দ্রুতপদে স্নানের ঘেরা স্থানটুকুতে ঢুকিয়া পড়িল!

হেরম্ব খানিকক্ষণ নড়িতে পারিল না। রাধার মন্তব্য খুব বেশি অদ্ভুত ও আকস্মিক তাহা নয়, ছেলেমেয়ে নাই শুনিয়া যে আশ্চর্য মুখভঙ্গি সে করিয়াছিল, এ-মন্তব্যের জন্য তার চেয়ে বিশদ ও সুস্পষ্ট ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য রূপ ও প্রতিভার অপচয়ে রাধা এমন বিচলিত হইল কেন? পরিচয় তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার!

পাতলা কাপড়ের আড়ালে রাধাকে ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল, একটুখানি বিদেহী সোনালী আভা। হেরম্ব বুঝিতে পারিল মাথায় জল দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া রাধা জলচৌকিতে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া হেরম্বও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

বারান্দা যেখানে বাহিরের ঘরের দিকে দিক্ পরিবর্তন করিয়াছে, সেখান হইতে একটি সুদীর্ঘ কালো ছায়া উঁকি মারিতেছিল, হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া চোখের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চলিতে আরম্ভ করিয়া হেরম্বর মনে হইল, এ মন্দ নয়। সম্মুখে যখন স্বহস্তরচিত বস্ত্রাবাসে স্বর্ণাভ ছায়া জ্বলজ্বল করে, পিছনে তখন বিপুল কালো ছায়া নিঃশব্দ প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া থাকে।

বাহিরের ঘরে পা দিতে দৈত্য সোজা দাঁড়াইয়া গম্ভীর আওয়াজে বলিল, সেলাম বাবু।

সেলাম। তুমি মুসলমান নাকি?

গোলাম মোছলমান।

লোকটার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া হেরম্ব পথে নামিয়া পড়িল। ইহার লোমশ হাতের এক টিপুনিতে গলার অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াইতে পারে কল্পনা করিতে গিয়া কৌতুকানুভূতির পরিবর্তে তাহার গলার মধ্যে খুসখুস্ করিয়া উঠিল।

দিন যায় আর হেরম্বর মনে হয় রাধা নিজে যেন ধাঁধা নয়, একটা অদ্ভুত রহস্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতেছে। বায়ুর মতোই হয়তো তাহা স্বচ্ছ, কিন্তু ধুলোবালিতে এমনই আবিল হইয়া উঠিয়াছে যে রাধাকে ঝাপসা মনে হয়।

জীবনে একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়াই তাহার যতটুকু অভিনবত্ব, নহিলে রূপের হিসাব ছাড়া প্রভার সঙ্গে তাহার পার্থক্য সম্ভবতঃ এতখানি নয়।

বিকালের দিকে প্রভা রাধার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। কেমন ভয়ে ভয়ে কথা কইল, খালি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তোমার বৌকে দেখে ওর লজ্জা পাবার কি আছে?

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, বোধহয় কৌতুক। ওকে দেখে আমার বৌয়ের লজ্জা পাওয়া উচিত।

প্রভা ম্লানমুখে বলিল, পাড়ায় যেসব কথা উঠছে, কানে গিয়েছে বোধহয়।

হেরম্ব হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, পাড়ার লোকের অজুহাত না দিয়ে যেদিন মনের কথাটা স্পষ্ট করে বলবে সেদিন এ-বিষয়ে আলোচনা করব প্রভা।

কিন্তু তুমি হতাশ হয়ো না। একদিক দিয়ে ভগবান যে তোমায় বঞ্চিত করেছেন সেইটাই বোধহয় আর একদিক দিয়ে এবার তোমার কাজে লাগবে।

জামা পরাই ছিল, প্রভার বিস্ময়কে উপেক্ষা করিয়া হেরম্ব বাহির হইয়া গেল। চশমাটা সে বদলাইয়াছে এবং এখন সকাল নয়, অপরাহ্ন। তথাপি তাহার চোখে পড়ন্ত সূর্যালোক বড় অস্বাভাবিক ঠেকিল। এতকাল অলস বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে যেন দেখিতে জানিত না, আজ দেখিতে শিখিয়াছে।

রাধা বলিল, আপনাকে আজ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। পাড়ায় নাকি কি সব কথা উঠেছে শুনলাম। আপনি কি মনে করেন আমার আসা-যাওয়া কমিয়ে দেওয়া উচিত?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাধা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল, ঠিক বুঝতে পারছি না। এ আমার কঠিন সমস্যা। বিনামূল্যে সুনাম বিলিয়ে দিলে আপনার যে সবটাই ক্ষতি দাঁড়াবে।

আর আপনার?

রাধা করুণভাবে হাসিল, আমার আবার লাভ-ক্ষতি! সে হিসাব চুকিয়ে ফেলেছি। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলে যাব কেউ তা জানে না, কলঙ্ক কিনতে আমার ভয় কি? একটু ভাবিয়া নতমুখে বলিল, কলঙ্ক রটলে বরং আমার সাহায্যই হবে। আমি জোর পাব।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনাইল, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল বিন্দুমাত্র বেমানান নয়। রাধা কবিত্ব করিতে বসে নাই, যে-রহস্য নিয়া সে জীবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাকে অর্থহীন ইঙ্গিতের সাহায্যে ঘনীভূত করিবার ইচ্ছাও রাখে না। বলিবামাত্র বুঝিতে পারার মতো বক্তব্য তাহার নয়।

রাধা আবার বলিল, আপনি আমায় এমন দ্বিধায় ফেলছেন! দশ বছর ধরে মনমরা হয়ে থেকে সেদিন যখন সকালবেলা আপনার বাড়ীর সামনে নামলাম, মনে হলো এতদিনে আমারও বুঝি কপাল ফিরল। কিন্তু দু-ঘণ্টার মধ্যে এমন কথাই শোনালেন যে প্রদোষের আধো অন্ধকার আমি আর অতিক্রম করতে পারলাম না। আচ্ছা —কম্পিত আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে বলিল, আচ্ছা আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?

সাত বছর।

সাত বছর! শিশু যে এল না, সে অপরাধ তবে কার? লজ্জা করবেন না, বলুন। এ না জানলে আমার চলবে না।

সেটা এখনও নির্ণীত হয়নি।

নির্ণীত হয়নি! রাধা স্তব্ধ হইয়া গেল।

হেরম্বের চোখে পলক নাই, শিরার রক্ত চলাচলের মাঝখানে একবার একটা-উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল, আবার তাহা শান্ত হইয়া গিয়াছে। কথা হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া, উঠানের একপাশে দৈত্য হাঁসের পালক ছাড়াইতেছিল,—বৃদ্ধের জন্য মাংসের জুস হইবে। দেখিতে দেখিতে হাঁসটা কদর্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। হেরম্বের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

প্রাণিহত্যা দেখলে কষ্ট হয়, না?

হেরম্ব উদাসভাবে বলিল, না।

আশ্চর্য! আমারও হয় না। তবে হয়তো আমার যে জন্য কষ্ট হয়—

আমারও সেজন্য কষ্ট হওয়া উচিত? হেরম্ব মৃদু হাসিল, তা হয়। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেই আমার সীমা, এ-চিন্তা সুখদায়ক নয়।

ইহার পর দু-জনে বহুক্ষণ কথা বলিল না। আকাশে বিকাল হইয়াছে, প্রভা যে বৈকালিক জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে বারংবার সেকথা হেরম্বের মনে পড়িতে লাগিল। এবং তাহাতে

বিস্ময়ের তাহার সীমা রহিল না। ক্ষুধার সাড়া নাই, প্রভার খাবারের কথা এত করিয়া মনে পড়ে কেন? বিশেষ করিয়া আজিকার এই অপরাহ্নে, এই রহস্যময়ীর সান্নিধ্যে চিন্তার জটিল পাক খাওয়ায়?

মাংস কাটিয়া দৈত্য উঠিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ হেরম্ব সচেতন হইয়া উঠিল, কড়া তামাকের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

রাধা চকিতভাবে বলিল, তামাকের গন্ধ পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। দৈত্য খাচ্ছে বোধহয়।

রাধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, তা কি ও খাবে! বাড়িতে তামাক টানতে ওকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি।

দৈত্য যে তামাক খাইতেছে না, প্রমাণ পাইতে দেরি হইল না। উভয়ের চোখের সামনে উঠান পার হইয়া সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। রাধা ত্বরিতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হেরম্ব বলিল, যান, কেড়ে নিন গিয়ে। আজ সারাদিন যদি কেশে থাকেন, এ-তামাকের ধোঁয়া ফুসফুসে গেলে বাঁচবেন না।

রাধা বিবর্ণমুখে বলিল, ক-মাস আগে মরবার ভয়ে ও দিশেহারা হয়ে যেত, এখন এমনভাবে তামাক খেতে আরম্ভ করেছে কেন হেরম্ববাবু? এ তো নেশা নয়।

না, নেশা নয়। বোধহয় রোগযন্ত্রণায়—

রোগযন্ত্রণায়? কি জানি কিসের যন্ত্রণা। আমার গা কাঁপছে হেরম্ববাবু। রাধার মুখ অস্বাভাবিক সাদা হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সে যেন ভয়ংকর ভয় পাইয়াছে। হতাশকণ্ঠে বলিন, ও টের পেয়েছে—কি করে ও যেন টের পেয়েছে। নিজে মরে আমায় তাই মেরে রেখে যেতে চায়।

রাধা অসহায়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িবার শক্তি যেন তাহার লোপ পাইয়াছে। প্রথম দিনের কথা হেরম্বের মনে পড়িল' এমনই বিহ্বলভাবে অন্ধকে বাঁচাইয়া রাখিতে রাধা তাহার সাহায্য

প্রার্থনা করিয়াছিল। অধরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, আসুন, পরে শুনব।

ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল তামাকে টান দিবার সুযোগ তখনো অধর পায় নাই, হুঁকা হাতে উঠিয়া বসিবার পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল।

হুঁকা কাড়িয়া নিতে চোখের রক্তবর্ণ গহ্বর দুটি উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, দুটো টান দিতে দাও রাধা। অনেক কষ্টে ধরিয়েছি। দাও, দাও বলছি আমার হুঁকো কল্‌কি!

অমন প্রচণ্ড শব্দ করিয়া কাশিলেও অধর কথা কয় ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া। হেরম্বের মনে হইল কথাকে বঞ্চিত করিয়া সে যেন কাশির জন্য শব্দ সঞ্চয় করে।

রাধা বলিল, তুমি মরতে চাও কেন?

চোখের গহ্বর আরও বেশি উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, আমি বাঁচতে চাইব কেন?

এ-প্রশ্নের জবাব নাই, বিছানার পাশে বসিয়া রাধা চুপ করিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত কান পাতিয়া থাকিয়া অধর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, ঘরে কে নিশ্বাস ফেলছে? কে এসেছে আমার ঘরে? সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টার সঙ্গে আন্দাজে হেরম্বের দিকে তর্জনী উদ্যত করিয়া সে যেন অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, কে ও? চোরের মতো আমার ঘরে কে এল?

রাধার ঠোঁট কাঁপিল কিন্তু কথা বাহির হইল না। হেরম্ব নিজের পরিচয় দিতে যাইতেছিল, ইঙ্গিতে রাধা বারণ করিল।

অধরের মাথা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, বিছানার চাদরটা দুই হাতের শীর্ণ আঙুলে মুঠো করিয়া ধরিয়া ভীতস্বরে অধর বলিল, ও যেই হোক, ওকে অত জোরে নিশ্বাস নিতে বারণ করো রাধা। না হয় তুমি কথা কও।

রাধা মৃদুস্বরে বলিল, উনি আমাদের প্রতিবেশী। তোমায় দেখতে এসেছেন।

অধর যেন এই সংক্ষিপ্ত জবাবটিরই প্রতীক্ষা করেতেছিল। একমুহূর্তে তাহার সকল উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। নির্জীবের মতো বালিশে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, আমার ঘরে ওকে কেন আনলে রাধা? এ তো ওর প্রতিবেশীর ঘর নয়! এ ঘরে কথা নেই,হাসি নেই, চোখে-চোখে চাওয়া নেই, শুধু আছে অন্ধকার। এ ঘরে উনি হাঁপিয়ে উঠবেন।

পরস্পরের চোখে চাহিয়া দু-জনে অন্ধের কথা শুনিতেছিল, রাধা চোখ নামাইয়া নিল। শান্তকণ্ঠে বলিল, উনি বুড়োমানুষ এসব অসুখের বিষয়ে অনেক বোঝেন—শোনেন, তাই এসেছেন। উনি এলে আমি অনেক ভরসা পাই।

অধর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অকালবৃদ্ধের অসুখ বুড়োমানুষেরা বোঝে না রাধা। তাদের অভিজ্ঞতা নেই।

এই বলিয়া অভ্যস্তভাবে প্রথমে দুই হাতে বুক চাপিয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস নিবার চেষ্টায় হাঁপাইয়া উঠিয়া সে কাশিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেকটি কাশির সঙ্গে চৌকি এমনভাবে নড়িতে লাগিল যে হেরম্ব বুঝিতে পারিল না রাধার সর্বাঙ্গ ঠিক কি কারণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

হুঁকাটা রাধা হেরম্বের হাতে দিয়াছিল। কলিকার আগুন নিবিয়া যায় নাই, পাক খাইয়া তাহা হইতে ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছিল। হেরম্ব অকস্মাৎ খোলা দরজা দিয়া হুঁকা-কলকি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য কাশি স্থগিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু একেবারে কমিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, অধরের সঞ্চিত শব্দ তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কাশিতেছে হিক্কা ওটার মতো। কাশির বিরামের অবসরে মাথা উঁচু করিবার চেষ্টায় চোখের গর্ত জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। প্রথম হইতে রাধার একটি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, এখনো ছাড়ে নাই। যে-দুর্নিবার স্রোত আজ

তাহাকে মরণের পরপারে ভাসাইয়া নিয়া যাইতে চায়, নোঙরের মতো রাধা যেন তাহাকে ব্যর্থ করিবে।

দেয়ালে ঠেস দিয়া রাধা মড়ার মতো চোখ বুজিয়া আছে।

দৈত্যের মুখখানা দেখিবার জিনিস। অতবড় বিপুল দেহে অমন অসীম শক্তি নিয়া সে যে শিশুর মতো ভীত অসহায় দৃষ্টিকে চারিদিকে সঞ্চালন করিতেছে, অন্ধের যন্ত্রণার চেয়ে তাহা যেন সকরুণ। ওর অল্প পরিমাণ মস্তিষ্কে কি ক্রিয়া চলিতেছে কে জানে? হঠাৎ রাধা বলিল, হেরম্ববাবু, ওঁকে বাঁচান। বেশি নয়, আর কয়েকটা মাস—শুধু আর কটা মাস ওকে আপনি বাঁচিয়ে রাখুন।

ডাক্তার উপস্থিত থাকিতে তাহাকে এই মিনতি জানানোর মধ্যে এমন ভয়ংকর একটা ইঙ্গিত ছিল যে হেরম্ব কোনো আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার গম্ভীরমুখে বলিলেন, ভয় পাবেন না। উনি 'বাঁচবেন বৈকি নিশ্চয় বাঁচবেন।

আশ্চর্য আশ্বাস, বিস্ময়কর মিথ্যা!

ডাক্তারের মুখের কথা শেষ হইবার একমিনিট পরেই ভয়ংকর একটা কাশির ধমকে একেবারে আধবসাঅবস্থায় উঠিয়া অন্ধের মৃত দেহটা আবার শুইয়া পড়িল।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই ডাক্তার নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

সকলে নীরব। প্রত্যেকের নিশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যায়। অকস্মাৎ এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দৈত্য হাউহাউ করিয়া উঠিল। ঠিক যে কান্না তাহা নয়, একপ্রকার দুর্বোধ্য ভয়ের শব্দ, আতংকভরা আর্তি।

পাড়ার কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন, হেরম্ব একজনকে নিম্নস্বরে বলিল, ও লোকটি মুসলমান, ঘর থেকে বের করে দিন।

বাহিরে যাওয়ার আদেশটা দৈত্য প্রথমে বুঝিতে পারিল না, বোঝামাত্র তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

প্রভা দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরে আসিয়া রাধার পাশে বসিয়া পড়িল। হেরম্বের বিধবা পিসিমাও আসিয়াছিলেন, রাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকো বাছা, একজনের ছুঁয়ে থাকতে হয়।

কাশির শেষ ধাক্কায় রাধার কবজিহইতে অধমের মুষ্ঠি খুলিয়া গিয়াছিল। তাহার পায়ে হাত রাখিয়া চোখ তুলিয়া পিসিমার বিধবা বেশ দেখিয়া রাধা যেন অবাক হইয়া গেল।

আমি তো কিছুই জানি না, এখনি কি সিঁদুর মুছে শাঁখা খুলে ফেলতে হবে?

তাহার এই কথার কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলের সময় লাগিল। হেরম্ব বলিল, এখন নয়, ফেরার সময় শ্মশানে।

শ্মশান কোথায় হেরম্ববাবু? শহরের বাইরে? লোকালয় ছাড়িয়ে?

দু-জনের মধ্যে শুধু মৃতদেহের ব্যবধান। সামনে ঝুঁকিয়া সকলের আশ্রাব্য স্বরে রাধা আবার বলিল, এবার থেকে শ্মশানে বাস করব—জীবনের শেষ সীমায়। মানুষের মধ্যে বাস করার অধিকার আমার ঘুচল।

রাধার দাদা আসিয়াছিলেন, হেরম্বের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতায় তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাই না হেরম্ববাবু। দু-দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছি, ফিরে দেখি রোগা স্বামীকে নিয়ে রাধা কোথায় যে গেছে কেউ বলতেপারে না। আপনার তার পাওয়া পর্যন্ত কি দুর্ভাবনাতেই যে দিন যাচ্ছিল।

হেরম্ব বলিল, আপনাকে খবর দেওয়ার মধ্যে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আপনার বোন তার করতে বলেছিলেন।

অ! বলিয়া দাদার কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস জুড়াইয়া গেল।

বিকালেই বিদায়ের আয়োজন। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া

গলির মুখে দাঁড়াইল। রাধার দাদা গাড়িতে জিনিস তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

রাধা বলিল, এ-বেশে ফিরতেহবে জানতাম, এভাবে ফিরব জানা ছিল না।

হেরম্ব নীরব হইয়া রইল।

রাবণের অবস্থা হলো আমার। দ্বিধা করে করে স্বর্গের সিঁড়ি আর তৈরি হলো না। আজ থেকে দশমাস সময় এখনো মানুষ আমায় দিয়েছে, মানুষ খুব বিবেচক, নয়?

এ-আলোচনা হেরম্বের আজ সহ্য হইতেছিল না। প্রসঙ্গান্তরের প্রত্যাশায় জিজ্ঞাসা করিল, দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

ওকে বিদায় করে দিয়েছি।

কেন?

সন্দেহে। ওর বুদ্ধি খুবই কম, কিন্তু কেশে কেশে যে মরতে বসেছে চাইলেই তাকে তামাক দিতে নেই, এটুকু কি আর ও বোঝেনি, প্রথমটা মনে করেছিলাম বোকামি, শেষে সন্দেহ হলো শয়তানী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

শয়তানী! হেরম্ব চাহিয়া দেখিল উঠানে হুঁকা-কলিকাটা এখনও পড়িয়া আছে।

—ঃ ঃ—